দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

মেবার-পতনের ভূমিকা

(নাটকের ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এবং অন্যান্য বিষয়ের বিশদ আলোচনা)

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, এম. এ., ডি ফিল.

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১ শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারী, ১৯৬০

মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

জানুয়ারী, ১৯৬০

শ্রীদীপঙ্কর বসু কর্তৃক জে. এন বসু এ্যাণ্ড কোং
৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীনিরঞ্জন বোস কর্তৃক, নর্দার্ণ প্রিণ্টার্স, ৩৪/২ বিডন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থঃ

১। রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য . … ১০৲

(গবেষণা গ্রন্থ)

২। রবীন্দ্র-নাট্য পরিচয় … ৬·৫০

(রাজা ও রাণী, বিসর্জন, তপতী, মালিনী প্রভৃতির বিশদ আলোচনা)

ক্ষীরোদপ্রসাদের

৩। নর-নারায়ণের ভূমিকা … ৩৲

(পৌরাণিক, সাহিত্যিক এবং অন্যান্য বিষয়ের বিশদ আলোচনা)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

৪। সাজাহানের ভূমিকা . ২৫০

(পূর্ণাঙ্গ আলোচনা)

ভূমিকা

দ্বিজেন্দ্রলাল ও মেবার পতন :

কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯শে জুলাই, ১৮৬৩, কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান সংগীতানুরাগী গায়ক, দৃঢ়চেতা, উদার-হৃদয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা। পিতার নিকট হইতে পুত্র অনেক গুণ লাভ করিয়াছিলেন।

বালক বয়স হইতেই তিনি কাব্য এবং সংগীত রচনা আরম্ভ করেন। প্রতিভাধর ব্যক্তিদের বাল্যজীবনই ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত করে—দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। স্বরচিত সংগীতে ইচ্ছামত সুরযোজনা করিয়া তিনি নিজেকে তৃপ্ত করিতেন।

রবীন্দ্রনাথেরই ন্যায় কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও অগ্রজদের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছিলেন। সেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে গড়িয়া তোলেন—সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলালও সেইরূপ দ্বিজেন্দ্র-মানস গঠনে সহায়তা করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীর ২য় স্থান অধিকার করেন এবং পরে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য ষ্টেট স্কলারশিপ লইয়া বিলাত যান। বিলাতে থাকাকালীন তিনি সেখানকার সংগীত শিক্ষা করেন—এই সংগীত রীতির প্রভাব তাঁহার উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্য ও নাটক পাঠ করিতে ভালবাসিতেন, বিলাতে আসিয়া 'বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয়' দেখিয়া তাঁহার 'অভিনয় ব্যাপারটিতে' আকর্ষণ এবং নাটক লিখিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

প্রায় তিন বৎসর বিলাতে থাকিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল দেশে ফিরিলেন। দেশে ফিরিয়া দুইটি বিশেষ অভিজ্ঞতা তাঁহার হইল। স্বাধীন চিত্ততার জন্য চাকুরী ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ শান্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত মতের যে অমিল ঘটিয়াছিল তাহাও বুঝিয়া লওয়া যায়। চাকুরীক্ষেত্রেই তিনি ব্যক্তিগত জীবনে পরাধীনতার বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন—তাঁহার সাহিত্যে তাই স্বাধীনতার জয়গান করা

হইয়াছে। 'মেবার পতন' নাটকেও সেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা দেখা যায়। বিলাত প্রত্যাগত বলিয়া বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন না; কিছু কিছু সামাজিক নির্যাতনও তাঁহার উপর হয় নাই এমন নহে। কেহ কেহ সামাজিক ক্রিয়াকর্মে তাঁহাকে বর্জনও করিয়াছিলেন—'এই অভাবিত প্রচণ্ড আঘাতে তিনি স্তম্ভিত, আহত ও মুহ্যমান হইয়া' গিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তের পরামর্শও দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। যেখানে অপরাধ নাই সেখানে প্রায়শ্চিত্তের কোন কথাই উঠিতে পারে না। 'মেবার পতন' নাটকে হিন্দুত্বের এই কুসংস্কারগ্রস্ত ক্ষুদ্রতার স্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলাল উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং উহার পরিণাম যে কি হইয়াছে তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছেন।

সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ :

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়, সেই আন্দোলনে সমস্ত বাংলা দেশ আলোড়িত হইয়াছিল। এই সময় বাংলা দেশে শিবাজী উৎসব অত্যন্ত উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার বারভুঁইয়া প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় প্রভৃতিকে বাঙ্গালীর মনে জাগ্রত করিবার জন্য তাঁহাদের স্মরণ করিয়াও উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। পূর্ব হইতেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মারফৎ জাতীয়তা প্রচার করিতেছিলেন—এইবার 'বন্দেমাতরম্' এবং 'যুগান্তর' প্রকাশিত হওয়ায় প্রচার ব্যবস্থা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। রবীন্দ্রনাথ 'ভাণ্ডার' পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশীয়ানার অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন এবং মানুষকে স্বাবলম্বী হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয় বরিশালে—সভাপতিত্ব করেন ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল। সভাপতি যে বক্তৃতা দেন তাহার একটি বিশেষ স্থান উদ্ধার করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থে—"রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা আমাদের স্বদেশীয় হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের সহযাত্রী।" এই বক্তব্যের তাৎপর্য আছে: হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির তখন বিশেষ চেষ্টা

চলিতেছিল। বাংলার লাট ফুলার স্বয়ং ছিলেন এই বিভেদ সৃষ্টির মূলে। শ্রীযুক্ত বাগল লিখিয়াছেন, "১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর মাননীয় আগাখাঁর নেতৃত্বে একদল মুসলমান প্রতিনিধি শিমলায় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হস্তে একখানা স্মারক লিপি অর্পণ করেন। তাঁরা তাতে সরকারী শাসন-পদ্ধতিতে মুসলমান সমাজের আস্থা জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে যে-সব ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হবে তার প্রত্যেকটিতে মুসলমানদের পৃথক ভাবে সদস্য-নির্বাচনের অধিকার ও জন সংখ্যার অনুপাতের চেয়েও অতিরিক্ত সদস্য-পদ দানের কথাও স্মারক লিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়।......লর্ড মিণ্টোও মুসলমান সমাজের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে আনন্দ প্রকাশ করলেন ও তাঁদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে তা পূরণে প্রতিশ্রুত হলেন।" এই খানেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। মুসলমান সম্প্রদায় পৃথক সংগঠন সৃষ্টিও করিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার মোসলেম শিক্ষা সম্মেলনে যাহার সূচনা হয় তাহাই পরিপূর্ণরূপ গ্রহণ করে অমৃতসরের সম্মেলনে। মুসলমানদের পৃথক সংগঠন দানা বাঁধিয়া ওঠে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় শিবাজী-প্রতাপাদিত্য-সীতারাম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া নানা উৎসব-অনুষ্ঠান হইতেছিল: সাহিত্যক্ষেত্রেও সেইরূপ বীরপুরুষদের কেন্দ্র করিয়া নাটক রচিত হইতেছিল জাতীয়-জীবনে উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬) মীরকাশিম (১৯০৬) এবং ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭); ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য (১৯০৩) পদ্মিনী (১৯০৬) চাঁদবিবি (১৯০৭) এবং অশোক (১৯০৮); দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতাপসিংহ (১৯০৬) দুর্গাদাস (১৯০৬) মেবার পতন (১৯০৮) জাতীয় চিত্ত উদ্বুদ্ধ করিতে বিশেষ সাহায্য করে। দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিয়াছিলেন যে কেবল হিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয় জীবনে উৎসাহ সঞ্চার করা যাইবে না। কংগ্রেসের আচরণের মধ্যে গঙ্গাস্নান প্রভৃতির যোগে কিছুটা হিন্দুয়ানী প্রবেশ না করিয়াছিল এমন নয়। কেবল হিন্দুকে আকর্ষণ করিয়াই জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা যাইবে না— মুসলমানকেও নিকটে আকর্ষণ করিয়া লওয়া চাই। নিজের জীবনে গোঁড়া হিন্দুত্বের অবিচারের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন; গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে মুসলমানের প্রতিও সেইরূপ বিদ্বিষ্ট হওয়া সম্ভব। জাতীয়তা উন্মেষের

সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল এই দিকেও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি এবং বিশেষ করিয়া 'মেবার পতন' রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্র নাটকের ভাষা :

প্রবহমান শোভাসম্পন্ন ভাষার জন্যই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক এক সময় এত অধিক আকর্ষণীয় ছিল। তাঁহার ভাষায় কবিত্ব এবং নাটকীয়তার অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে ; ভাষা নমনীয় হইলেও শক্তিশালী।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে তাঁহার নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগও করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে গদ্যকেই নাটকের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন বলিয়া মনে করেন। মানুষ গদ্যেই কথা বলে, তাই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের পক্ষেও গদ্যে কথা বলাই স্বাভাবিক বলিয়া তাঁহার মনে হয়। পাঠকদের নিকট কাব্যের ভাষার একটা আবেদন থাকিতে পারে কিন্তু বর্তমান কালের বাস্তব ঘেঁসা দর্শকরা নাটকের ভাষার সহিত নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সংলাপ মিলাইয়া দেখিতে চায়, সুতরাং তাহাদের নিকট গদ্যের ভাষার আবেদনই অধিক। বিশেষ স্বদেশী-আমলে জাতীয় জীবনকে সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে যে নাটকগুলি লিখিত তাহাদের ভাষার মধ্যে বিশেষ তীক্ষ্ণতা থাকা প্রয়োজন। এই কারণেও এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ করিয়া গদ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। 'প্রতাপসিংহ'ই তাঁহার সম্পূর্ণ গদ্যে রচিত প্রথম নাটক। 'মেবারপতন'ও সম্পূর্ণরূপে গদ্য সংলাপে রচিত।

নাটকে সম্পূর্ণরূপে গদ্য প্রয়োগ করা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল জানিতেন যে নাটকও সাহিত্য ; ইহাতে একদিকে যেমন মনের ভাব জানাইতে হইবে অপরদিকে সেইরূপ দর্শকদের মনকে জাগাইতেও হইবে। সুতরাং নাটকের গদ্যে বিশেষ আবেগ সঞ্চার করিতে হয়—দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাষা পাত্র-পাত্রীর মনোভাব স্পষ্ট উদ্ঘাটিত করিয়াছে এবং নাটকে বিশেষ গতির সঞ্চারও করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার নাটকের গদ্যকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে অবশ্য অনেক স্থলেই আবেগের কিছু বাড়াবাড়ি

দেখা গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার ভাষা সহজেই পাঠক-দর্শক-চিত্ত স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের উপর তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, ইচ্ছামত তাই তিনি তাঁহার গদ্যকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিতে পারিয়াছেন। চিত্র এবং সুরের সমন্বয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয় ইহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন—তাঁহার ভাষায় গতি এবং চিত্রণের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। শক্তি থাকিলে ভাষাকে লইয়া যে ইচ্ছামত ক্রীড়া করা যায় তাহার প্রমাণ চাণক্যের সংলাপ: ভাষাকে সুউচ্চ পর্যায়ে তুলিয়া কোন্ উপায়ে মুহূর্তে নীচে নামাইয়া আনা যায় তাহা তিনি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা গতিশীল হইলেও বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ বলিয়াই তাহার প্রয়োগ এইরূপ সার্থক হইয়াছে।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশের বাহন—দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা তাঁহার পাত্র-পাত্রীর মনোভাব স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। একটি বাক্যের পুনরাবৃত্তির দ্বারা একসময় মুকুন্দরাম শোক গভীরতররূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'বৈশাখ হৈল বিষ গো, বৈশাখ হৈল বিষ' অথবা, 'বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।' দ্বিজেন্দ্রলালও জানিতেন যে একটি কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া ভাবকে তীব্রতর এবং তাৎপর্য মণ্ডিত করা যায়: 'মেবার পতন'-এর ২য় দৃশ্যে রানা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন দেখিয়া গোবিন্দ সিংহের মনোভাব প্রকাশে নাট্যকার সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন—"একটা চেষ্টা, একটা উদ্যম, একটা প্রতিবাদও না করে'—'। এই 'একটা' কথাটির পুনরাবৃত্তির দ্বারা গোবিন্দসিংহের মনের উদ্বেগ এবং আগ্রহ লেখক একই সঙ্গে কৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে চরিত্রের একটা বিশেষ পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তবে এইরূপ বাক্যবিন্যাসের অত্যধিক প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে লেখকের ইহা মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যের প্রবহমানতা, গাম্ভীর্য এবং ভাবপ্রকাশের উপযুক্ততা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে ইহাতে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব আছে। সমস্ত চরিত্রের মুখেই তিনি একই ভাষা দিয়াছেন—কিন্তু সকলেই তো একই ভাষায় কথা বলিতে পারে না। তাঁহার সম্রাটের ভাষা এবং দাসীর ভাষা একই প্রকার। তাঁহার ভাষা ভাবের সন্ধান দেয় বটে কিন্তু চরিত্রের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখে। সংলাপের সাহায্যে চরিত্র-

বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে তিনি পারেন নাই : গদ্যের মধ্যেও কাব্যরস সৃষ্টির একান্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল বলিয়াই এই ত্রুটি দেখা গিয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার অমরসিংহ-গোবিন্দসিংহরা যে ভাষায় কথা বলেন ঠিক সেই ভাষাই শুনিতে পাওয়া যায় সৈনিক-গ্রামবাসীদের মুখেও। ইহার ফলে অনৌচিত্য দোষে অনেক সময়েই তাঁহার ভাষা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের জীবনে কেবল উঁচু ভাবই থাকে তাহা নহে, কেবল উঁচু সুরেই মনের তার বাঁধা থাকে না—দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা মানুষের মনের সাধারণ ভাব প্রকাশের একেবারেই উপযোগী নয়। সেই কারণে সামাজিক নাটকের জন্য এই ভাষার সার্থকতা নিতান্তই অল্প।

ঐতিহাসিক ভিত্তি :

টডের এ্যনাল্‌স্‌ এণ্ড এন্টিকুইটিস্‌ অব রাজস্থান—

লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল জেম্‌স্‌ টডের 'এ্যনাল্‌স্‌ এণ্ড এ্যন্টিকুইটিস্‌ অব রাজস্থান' গ্রন্থে মেবারের যে ধারাবাহিক ইতিহাস আছে তাহাতে অমরসিংহের বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায়। অমরসিংহ সম্বন্ধে প্রতাপসিংহের মনে একটা শঙ্কা ছিল—এই শঙ্কা তাঁহার মৃত্যুকালেও তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে পুত্র অমরসিংহ আরামপ্রিয় হইয়া উঠিবে এবং এই আরামপ্রিয়তাই দেশের স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত নষ্ট করিবে। তাঁহার শঙ্কা লক্ষ্য করিয়া সালুম্ব্রা সর্দারের নেতৃত্বে অন্যান্য সর্দারেরা প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহারা অমরসিংহকে বিলাসী হইতে দিবেন না।

মেবারের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু আকবর প্রতাপের মৃত্যুর পরেও আট বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু তিনি নানা কারণে অমরসিংহকে শান্তিতে কাল কাটাইতে দেন। শান্তির ফলে অমরসিংহ একটু বিলাসের দিকে ঝুঁকিলেন এবং যে হ্রদের তীরে প্রতাপসিংহ কুটির নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন সেখানে তিনি একটি ছোট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'অমর মহল'। অমরসিংহ রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিছু সংস্কার সাধনও করিলেন। সিংহাসনে আরোহণের চার বছর পরে জাহাঙ্গীর রাজস্থানের শেষ স্বাধীন রানা অমরসিংহকে জয় করিবার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিলেন। আরামপ্রিয়তার জন্য এবং হয়তো বা দেশের শান্তিভঙ্গ না করিবার ইচ্ছায় অমরসিংহ প্রতাপের পুত্রের ন্যায় আচরণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার

এই আরামপ্রিয়তার সমর্থন করে এমন তোষামোদকারীর অভাব ছিল না। তাঁহারা অন্যান্য রাজপুত রাজাদের ন্যায় তাঁহাকেও সম্রাটের নির্দেশ (ফরমান) গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিল। সর্দারেরা এই সময়ে তাঁহার নূতন প্রাসাদে আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিলেন। বীর চন্দাবৎ সালুম্ব্রা সর্দারদের আরও সক্রিয় হইয়া উঠিতে আহ্বান করিলেন এবং প্রতাপের মৃত্যুকালে তাঁহারা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। সকল সর্দারই প্রতাপের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—'আড়ম্বর পূর্ণ পরাধীনতা অপেক্ষা দুঃখজনক স্বাধীনতা'ই তাঁহারা প্রেয় এবং শ্রেয় বলিয়া মনে করিলেন।

অমরসিংহের প্রাসাদে একটি চমৎকার আয়না শোভা পাইত। রানাকে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিয়া মেঝের কার্পেট যথাযথভাবে সজ্জিত রাখিবার জন্য যে ভারি পিত্তলখণ্ডটি রাখা হইয়াছিল তাহাই তুলিয়া লইয়া উত্তেজনায় সালুম্ব্রা সর্দার আয়নার উপর নিক্ষেপ করিয়া রানাকে সিংহাসন হইতে টানিয়া লইয়া উপস্থিত সর্দারদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'অশ্বারোহণ করুন সর্দারগণ—প্রতাপের পুত্রকে অগৌরব হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব নিন'। অশ্বারোহণে বাধ্য হইয়া এবং বীর সর্দারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অমরসিংহের চিত্তেও উন্মাদনা দেখা দিল। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই মনস্থির করিলেন এবং সকলকে অভিবাদন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সালুম্ব্রার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া তিনি বলিলেন, "আমাকে পরিচালিত করুন—মৃত রানার কথা স্মরণ করিয়া আর আপনাদের দুঃখ করিতে হইবে না।" উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিয়া রাজপুতেরা খাঁ-খানানের ভ্রাতার নেতৃত্বে পরিচালিত সম্রাটের বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিল।

দুই বৎসর পরেই রণপুরের গিরিপথে আবদুল্লার অধীনে প্রেরিত আরও অধিকসংখ্যক সম্রাটসৈন্যকে কঠিনতর সংগ্রামে অমরসিংহ পর্যুদস্ত করিলেন।

পর পর দুইটি যুদ্ধে এইরূপে পরাজিত হইয়া জাহাঙ্গীর চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। চিতোরে অন্য এক রানাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বশীভূত প্রতাপ-ভ্রাতা সগরসিংহকে সেখানে রাজত্ব করিতে পাঠাইলেন—চিতোর তখন মোগলের অধিকারে ছিল। সাত বৎসর সগর সিংহ চিতোর দুর্গে ছিলেন ; কিন্তু ক্রমেই পূর্বপুরুষদের বীরত্বের স্মৃতি তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল—ভূতে পাওয়া মানুষের ন্যায় তাঁহার অবস্থা হইয়া

উঠিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত অমরসিংহের হস্তে চিতোর দুর্গ সমর্পণ করিয়া তিনি কান্দাহারের নির্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে জাহাঙ্গীরের সভায় গিয়া তিনি সম্রাটের সম্মুখেই নিজ বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

যাহা হউক অমরসিংহকে চূর্ণ করিবার জন্য সম্রাট এইবার বিশাল বাহিনী সজ্জিত করিয়া আজমীর হইতে নিজের ব্যক্তিগত তদারকিতে এবং পুত্র পরভেজ-এর সৈনাপত্যে যুদ্ধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিলেন। যুদ্ধ যাত্রাকালে পরভেজকে সম্রাট নির্দেশ দিয়াছিলেন যে রানা অথবা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র করণসিংহ যদি পরাভব স্বীকার করেন তবে যেন তাঁহাদের সহিত উপযুক্ত শোভন আচরণ করা হয় এবং রাজ্যের যেন কোন ক্ষতি সাধন না হয়। কিন্তু রানা বশ্যতা স্বীকার দূরের কথা জয়ের উন্মাদনায় খাম্নোরের গিরিপথে সম্রাটের বাহিনীর সম্মুখীন হন, রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। পরভেজ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলায়ন করে। মোগলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মহাবৎ খাঁর পরামর্শ সত্ত্বেও পরভেজের পুত্রেরও পিতার ন্যায় অবস্থাই হইয়াছিল—তাহার সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং সে নিজে যুদ্ধে নিহত হয়।

পর পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় রাজপুতবাহিনী সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হইয়া পড়ে। এই সময় বিশালতম সৈন্যবাহিনী লইয়া জাহাঙ্গীরের সর্বাপেক্ষা কুশলী এবং বীর পুত্র খুরম্ (পরবর্তীকালের সাজাহান) অমরসিংহকে আক্রমণ করেন। রানা এবং করণসিংহ মুষ্টিমেয় সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রায় আটশত বৎসর স্বাধীনতা রক্ষার পর বাপ্পাদিত্যের বংশধর অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তথাপি রাজ্যের বাহিরে গিয়া তিনি খুরমের নিকট হইতে সম্রাটের নির্দেশ লইতে স্বীকৃত হন নাই। রানা তাঁহার রাজধানীর বাহিরে আসিয়া বাদশাহের নির্দেশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে খুরম্ তাঁহাকে বন্ধুত্ব দিবেন এবং মেবার হইতে সমস্ত মুসলমান সৈন্য অপসারণ করিবেন জানাইয়াছিলেন। রানা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। নিজ রাজ্যের মধ্যেই অমরসিংহ খুরমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন—ভবিষ্যৎ সম্রাটও রানাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অমরসিংহ বন্ধুর ন্যায়ই বাদশাজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং পরাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ কোনও খেলাৎ বা পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই।

কিছুদিন পরেই তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুত্রের হাতে রাজ্যভার তুলিয়া দেন।

প্রকৃত বীর হইতে যে দৈহিক এবং মানসিক গুণের প্রয়োজন অমরসিংহের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল। মেবারের রাজবংশে তাঁহার ন্যায় দীর্ঘকায় এবং বলশালী আর কেহ ছিল না। বীরত্ব, শক্তি এবং মহত্ত্বের জন্য তাঁহার সর্দারেরা তাঁহাকে ভালবাসিতেন—সহৃদয়তা এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি প্রজাদের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

টডের গ্রন্থ হইতে সগরসিংহ, মহাবৎ খাঁ এবং গজসিংহ সম্বন্ধেও কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কুশলী আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে অনেক রাজপুত রাজা এবং বীর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রতাপের ভ্রাতা সগরসিংহ পর্যন্ত আকবরের দলে যোগ দেন এবং পুরস্কার স্বরূপ নিজ গোষ্ঠির পুরাতন রাজধানী কান্দাহার রাজ্য এবং দুর্গ লাভ করেন। সগরের বংশধরদের সগরবৎ বলা হয়।

সগরসিংহের পুত্র মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া মহাবৎ খাঁ নামে খ্যাত হন। জাহাঙ্গীরের সেনাপতিদের মধ্যে মহাবৎ-ই ছিলেন সর্বাপেক্ষা সাহসী। আকবর যখন যুবরাজ সেলিমকে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন তখন মানসিংহ এবং মহাবৎ খাঁ সেলিমকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। অমরসিংহের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেন নাই—পরভেজের পুত্রের পরামর্শদাতার কার্য মাত্র তিনি করিয়াছিলেন।

মাড়ওয়ারের ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া টড বলিয়াছেন যে জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণের সময় মাড়ওয়ারের রাজা শূরসিংহ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী পুত্র গজসিংহকে লইয়া সম্রাটের সভায় আসিয়াছিলেন। বিহারী পাঠানের বিরুদ্ধে গজসিংহকে প্রেরণ করা হইয়াছিল—আলাউদ্দীনের যে কার্য সাধন করিতে কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল, গজসিংহ তাহাই তিন মাসে সমাধা করেন। খুরমের বাহিনীর সহিত মেবার আক্রমণ করিতে তাঁহার মাড়ওয়ারের সৈন্যদলসহ গজসিংহও প্রেরিত হন। গজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামও অমরসিংহ—সে তাহার পিতার সহিত সমস্ত যুদ্ধেই যোগ দিয়াছে—পিতার যুদ্ধ জয়ে তাহার বীরত্বের দান কম নহে। গুজরাটে এক যুদ্ধে গজসিংহ নিহত হন।

কিন্তু টডের 'রাজস্থান'কে প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় না। মোগল ও

রাজপুতদের কিছু নথিপত্র এবং কিংবদন্তি ও চারণ-চারণীদের সংগীতই ছিল টডের উপজীব্য। রাজপুতদের প্রতি টডের শ্রদ্ধার পরিচয় আছে তাঁহার গ্রন্থে। কিন্তু ইতিহাসের সন্ধান অন্যত্র করিতে হইবে।

জাহাঙ্গীরের বর্ষপঞ্জী বলিয়া খ্যাত 'ওয়াকিয়াত-ই জাহাঙ্গীরী'তে উল্লিখিত আছে যে জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে খুরম্‌কে মেবার আক্রমণে প্রেরণ করেন। ইহার পূর্বে খান্-ই আজম্-এর নেতৃত্বে তিনি এই কার্যে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। খান্-ই আজমের অনুরোধেই সম্রাট আরও ১২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ খুরম্‌কে সেনাপতি করিয়া পাঠান; অথচ আশ্চর্য এই যে খান খুরম্‌কে খুসী মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই কারণে বিরক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত উদয়পুরে গিয়া খান্-ই-আজম্‌কে লইয়া আসিবার জন্য সম্রাট মহাবৎ খাঁকে প্রেরণ করেন। কয়েকদিন পরেই খুরম্ সম্রাটকে সংবাদ দেন যে ১৭টি হস্তীসহ তিনি রানার প্রিয় হস্তীটিকে অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং মহাবৎ খাঁ খুরমের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন এই কথা স্বীকার্য নহে। এই 'বর্ষপঞ্জী'ও সম্পূর্ণরূপে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

মেবারের রানাদের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ বহুপূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। দুর্ধর্ষ মোগলের বিরুদ্ধেও মেবার বহুদিন স্বাধীনতার গৌরবপূর্ণ পতাকা উড্ডীন রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ মেবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সকল দিক দিয়া দেশকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল রানা অমরসিংহের উপর। রানা সাধ্যমত সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন: যুদ্ধের ফলে যাহারা বাস্তহারা হইয়াছিল তাহাদের অর্থ সাহায্য দিয়া তিনি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিলেন। পদাতি-সাদী-নিষাদী-রথীর সমন্বয়ে তিনি নিয়মিত সৈন্যবাহিনীও গঠন করেন। উপযুক্ত সেনাপতি হরিদাস ঝালার উপর তিনি সৈন্য বাহিনী নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। অস্ত্র নির্মাণেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই—সুতরাং মোগলের নিশ্চিত আক্রমণের কথা স্মরণ করিয়াই তিনি যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করা চলে না।

জাহাঙ্গীর মেবারকেই তাঁহার আক্রমণের কেন্দ্রস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের পরের বৎসরই তিনি মেবার আক্রমণের জন্য যুবরাজ পরভেজকে প্রেরণ করেন। যুবরাজের সঙ্গে সম্রাট সগরসিংহকেও পাঠাইয়াছিলেন। যুদ্ধে পরভেজ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই।

প্রায় তিন বৎসর পরে সম্রাট মহাবৎ খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী মেবারে প্রেরণ করেন। মহাবৎ রাজপুত-প্রতিরোধ ব্যবস্থা চূর্ণ করিয়া গিরিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন। যে স্থানের উপর দিয়া তিনি গিয়াছেন তাহাই তাহার হত্যার তাণ্ডবের পরিচয় পাইয়াছে। রানা মেবারের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পিছু হঠিয়া গিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার পুত্রগণ এবং সেনাপতিরা সময়ে অসময়ে আকস্মিক আক্রমণ করিয়া মহাবৎ খাঁকে পর্যুদস্ত করিয়া তুলিলেন। শেষ পর্যন্ত মোগল সেনাপতিকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একান্ত হতাশ মনে মেবার ত্যাগ করিতে হয়। সগরসিংহকে চিতোরে রাখিয়া মহাবৎ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

ক্রুদ্ধ সম্রাট পরের বৎসরই সাহসী সেনাপতি আবদুল্লাকে মেবার যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাঁহার ললাটেও পরাজয়ের কলঙ্ক লেপন করিয়া দিল মেবারের বীরগণ। তিন বৎসর পর যুদ্ধে প্রেরিত হইল অযোগ্য সেনাপতি রাজা বাসু। বীর সেনাপতিরা যাহা পারেন নাই রাজা বাসুর পক্ষেও তাহা সাধন করা সম্ভব হইল না। পরের বৎসরই খুরম্ যুদ্ধ যাত্রা করেন। রাজপুতরা অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাভূত হইল। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল: ১৬১৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে খুরম্ মেবার যাত্রা করেন এবং ১৬১৫ খ্রীঃ রানা অমরসিংহের সহিত তাঁহার শান্তি চুক্তি হয়। এই যুদ্ধে বহু মেবারবাসী নিহত হয়, মন্দির ধ্বংস হয়—নারী এবং শিশুদের বন্দী করিয়া দাস রূপে বিক্রয় করা হয়। এই বীভৎসতা দেখিয়া অবশেষে সর্দারদের পরামর্শে রানা সন্ধি করিতে সম্মত হন।

সন্ধির পর রানা পুনরায় সর্দারদের পুনর্বাসনের চেষ্টা আরম্ভ করেন—এই সময়ে শিক্ষার প্রসারের জন্যও তিনি যথাসাধ্য অগ্রণী হন। এই শেষ জীবনেই রানা অমরসিংহ বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৬২০ খ্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী রানা করণসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং অমরসিংহ জীবিতকালেই পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন এই কথা গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই।

সগরসিংহ :

রানা প্রতাপের ভ্রাতা। প্রতাপের সহিত বিরোধ হওয়ায় সগর মোগলদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে রানা উপাধি দিয়া চিতোরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মোগল স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। অমরসিংহের সহিত সম্রাটের চুক্তি হইলে সগরসিংহকে চিতোর পরিত্যাগ করিতে হয়। তাঁহাকে প্রথমে মধ্য ভারতের একটি অঞ্চলে জমিদার করা হইয়াছিল, পরে তিনি বিহারে গমন করেন। ১৬১৭ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহার নাটকীয় মৃত্যু ঘটে নাই।

রাজা গজসিংহ :

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দশম বৎসরে পিতা শূরসিংহের সহিত গজসিংহ সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করিতে রাজধানীতে আসেন। পিতার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের চতুর্দশতম বৎসরে তিনি তিন হাজার পদাতিক এবং দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদার হন এবং রাজা উপাধি লাভ করেন। ক্রমে তাঁহার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সম্রাট পরিবারের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। যদিও তিনি কনিষ্ঠ পুত্র যশোবন্তসিংহকে নিজ রাজত্ব দিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র অমরসিংহকে তিনি নির্বাসিত করেন নাই। রাঠোরের এক বিশেষ প্রথার জন্যই যশোবন্ত সিংহাসন পান। তিনি যে সময়ে মনসবদার হন সেই সময়েই খুরম্ মেবার আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সেই বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন কিনা সন্দেহ। মহাবৎ যখন মেবার আক্রমণ করেন তখন যে তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহাবৎ খাঁ :

তিনজন মহাবৎ খাঁর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে মহাবৎ খাঁ খাঁ খানান সিপাহশালার নিজের প্রতিভাবলে এক সময় প্রধান সেনাপতি পদ পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। নাটকের মহীপৎ এই মহাবৎ খাঁ-ই। ২০০০ হাজার রাজপুত সৈন্য তাঁহার একান্ত বিশ্বস্ত ছিল—এই কারণেই হয়তো টড তাঁহাকে প্রতাপ-ভ্রাতা সগরসিংহের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন কাবুলের অধিবাসী: তাঁহার নাম ছিল জমান বেগ, পিতার নাম ঘাইয়ার বেগ কাবুলী। ইহারা রাড়াবী বংশীয়

সৈয়দ। অল্প বয়সেই জমান বেগ যুবরাজ সেলিমের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন এবং নিজের প্রতিভাবলে কিছুদিনের মধ্যেই মনসবদারী লাভ করেন। যুবরাজ সেলিমের প্রিয়পাত্র হইয়া ওঠায় তিনি মহাবৎ খাঁ উপাধি পান।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকেই তিনি তিন হাজারী মনসবদার হন—রানা অমরসিংহের বিরুদ্ধে এই সময়ে তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে তিনি কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সাজাহান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহাবৎ খাঁকে খাঁ খানান সিপাহ-শালার উপাধি দেন—তিনি ৭,০০০ পদাদিক এবং ৭,০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদারী লাভ করেন। তিনি আজমীর, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তাও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সম্রাটের কার্যে কোন শিথিলতা প্রদর্শন করেন নাই। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আড়ম্বরকে স্বীকার করেন নাই। ধর্মজ্ঞান তাঁহার বিশেষ ছিল না, তবে জ্যোতিষ বিদ্যায় তিনি সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ উদারও ছিলেন। ১৬৩৪ খ্রীঃ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অঙ্ক : তাৎপর্য বিশ্লেষণ :

প্রথম অঙ্ক :

১ম দৃশ্য :

সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহের কুটীর—কাল, মধ্যাহ্ন।

মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। রানা অমরসিংহ সন্ধি করিবার জন্য উন্মুখ; তিনি মনে করেন যে দেশ এখন অনেক সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে—রক্তস্রোত বহাইয়া দেশের ক্ষতি সাধনের কোন প্রয়োজন নাই। শান্তি রক্ষার জন্য অমরসিংহ অধীনতা বরণ করিতেও প্রস্তুত। সন্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি সামন্তদের আহ্বান করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে গোবিন্দসিংহকেও সভায় যোগদানের নির্দেশ দিয়াছেন। পুত্র অজয়সিংহের নিকট অমরসিংহের সেনাপতি গোবিন্দসিংহ এই সংবাদ পাইলেন। সালুম্ব্রাপতি চন্দাবৎ সর্দার গোবিন্দসিংহের অন্তর গর্জন করিয়া উঠিল—আক্রমণকারী মোগলের সঙ্গে তিনি কখনও সন্ধি করেন নাই, পঞ্চ-

বিংশতি বৎসর ধরিয়া তিনি যুদ্ধই করিয়াছেন। গোবিন্দসিংহের স্মৃতিতে প্রতাপের গৌরব-গাথা জাগিয়া উঠিল, মরিবার সময় প্রতাপ বলিয়াছিলেন, "অমরসিংহের রাজত্বকালে মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে"। গোবিন্দসিংহ জানেন যে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তথাপি তিনি সন্ধিকে ঘৃণা করেন। যে স্বাধীনতার গৌরবে 'উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহারা বার বার মোগল শক্তিকে প্রতিহত করিয়াছেন সেই স্বাধীনতা গোবিন্দসিংহ বাঁচিয়া থাকিতে কিছুতেই বিক্রীত হইবে না।

গোবিন্দসিংহ দেওয়াল হইতে তাঁহার কোষবদ্ধ তরবারিটি গ্রহণ করিলেন, উহাকে কোষমুক্ত করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ঘুরাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ দেহ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে—মনে অমিত উৎসাহ, অথচ দেহ অশক্ত, গোবিন্দসিংহের জীবনে ইহাই ট্রাজেডি : তাঁহার চক্ষে অশ্রু বিন্দু দেখা দিল।

গোবিন্দের কন্যা কল্যাণী পিতার হস্তে তরবারি দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গোবিন্দসিংহ উত্তর করিলেন যে তরবারি মুসলমানের রক্ত পান করিতে চায়। ব্যথিত কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলে। তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া গোবিন্দসিংহ প্রস্থান করিলে কল্যাণী আপন মনেই বলিয়া ওঠে, "যদি জান্তে বাবা। যদি বুঝতে !—"

গোবিন্দসিংহের কথা দিয়া দৃশ্যটি আরম্ভ হইয়াছে—"মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করতে এসেছে, একথা রাণা কার কাছে শুনেছেন অজয় ?" সংলাপ আরম্ভ করিবার সুযোগ লইতে গিয়া নাট্যকার রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থায় এবং চরিত্রে ত্রুটি ঘটাইয়াছেন। চন্দাবৎ সর্দার গোবিন্দসিংহ পচিশ বৎসর ধরিয়া মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন ; অমরসিংহের বিলাস তিনি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বয়োবৃদ্ধ অশক্ত হইলেও তিনি মেবারের সেনাপতি, সুতরাং মেবারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইবে। পার্বত্য প্রদেশের সমস্ত পথ-ঘাট-সুড়ঙ্গপথ নখদর্পণে বলিয়াই প্রতাপের পক্ষে মোগলকে প্রতিহত করা সম্ভব হইয়াছিল। শত্রুর সংবাদ চরের মুখেই তাঁহারা সংগ্রহ করিতেন। এই ব্যবস্থাপনা সেনাপতিকেই প্রধানত করিতে হয় সুতরাং গোবিন্দসিংহের মুখে নাট্যকার যে কথাটি বসাইয়াছেন তাহা উপযুক্ত হয় নাই—ইহাতে মনে হয় সেনাপতি অপেক্ষা রানা অধিকতর সক্রিয়। ইহার কিছু পরেই পুত্র অজয় যখন জানাইল

যে রানা সামন্তদের সহিত গোবিন্দসিংহকেও পরামর্শের জন্য আহ্বান করিয়াছেন তখন গোবিন্দসিংহের উত্তর 'আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য' একেবারেই অর্থহীন। পরামর্শের জন্য সেনাপতিকে নিশ্চয়ই আহ্বান করিতে হইবে। রাজ্যের বিপদে তাঁহারই তো সর্বাগ্রে যাওয়া কর্তব্য; বিশেষ, স্বাধীনতা পিয়াসী সেনাপতির পক্ষে রানার সন্ধির কথা শুনিয়াও নিষ্ক্রিয় থাকা নিতান্তই অসম্ভব। এই দৃশ্যেই গোবিন্দসিংহের যে তেজোদ্দীপ্ত হৃদয়ের পরিচয় আছে তাহার সহিত তাঁহার প্রথম দিককার কথাগুলির সামঞ্জস্য করা যায় না।

গোবিন্দসিংহকে দিয়া নাট্যকার বলাইয়াছেন, "যখন বিলাস এসে স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যের স্থান সবলে অধিকার করল—তখনই বুঝেছিলাম যে মেবারের পতন বহু দূর নয়! সে মহাপুরুষ মরবার সময় বলে ছিলেন যে, তাঁর পুত্র অমরসিংহের রাজত্বকালে মেবারের গরিমা মোগলের পদে বিক্রীত হবে।"

নাট্যকার টডের গ্রন্থকেই মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছেন। টডের গ্রন্থে উল্লিখিত প্রতাপের আশংকা সালুম্ব্রার কণ্ঠে দেওয়া হইয়াছে। গোবিন্দসিংহের কথায় এবং আচরণে নাট্যকার দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করিয়াছেন।

কল্যাণীর স্বগতোক্তির মধ্যে এক বিশেষ ইঙ্গিত আছে। পিতাকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতে দেখিয়া সে শংকিত: এই শংকার কারণ কি তাহা স্পষ্ট না হইলেও কল্যাণীর অন্তরের কোন ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়াই যে তাহা উদ্ভূত তাহা বোধগম্য হয়। পিতা মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহেন, কন্যার মন তাহার বিরোধিতা করে। বিসয়টা স্পষ্ট না হওয়ায় নাটকীয় 'সাসপেন্স্' সৃষ্টি হইয়াছে। একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বও ইহাতে আভাসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য:

উদয়পুরের পথ—কাল, অপরাহ্ন।

সত্যবতী চারণের দল লইয়া 'মেবার পাহাড়' সংগীতটি গাহিতে গাহিতে উদয়পুরের পথ চলিবার সময় অজয়সিংহের সাক্ষাৎ পাইল। অজয়সিংহের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যবতী জানিল যে রানা মোগলের সহিত সন্ধির

পক্ষপাতী, কিন্তু সেনাপতি গোবিন্দসিংহ যুদ্ধ করিতেই চাহেন। অজয়ের কথা শুনিয়া চারণদলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সত্যবতী অন্য কোথাও গেল।

'মেবার পাহাড়' সংগীতের সাহায্যে সত্যবতী জাতির অন্তর প্রস্তুতির কাজ করিতেছে। সন্ধির কল্পনা তাহার নিকটও অসহ্য। গোবিন্দসিংহ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক শুনিয়া সে সন্তুষ্ট হইল। প্রতাপের পুত্র হইয়া অমর সিংহ কি করিয়া সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তাহা সে ভাবিতেও পারিল না।

তৃতীয় দৃশ্য :

উদয়পুর মেবারের রাজসভা—কাল, প্রভাত।

মেবারের রাজসভায় পরামর্শরত রানা, সামন্তগণ এবং সেনাপতি গোবিন্দসিংহ। প্রত্যেক সামন্তেরই যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা, একমাত্র রানা অমরসিংহ সন্ধি করিতে চাহেন। বিশ্বপ্রেমের আদর্শবাদের কোন পরিচয় এখনও রানার মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি শুধু উপলব্ধি করিয়াছেন যে বিরাট মোগল বাহিনীকে পরাভূত করা যাইবে না, যুদ্ধে পরাজয় যখন অবশ্যম্ভাবী তখন দেশের সমৃদ্ধি নষ্ট করিয়া লাভ কি। দেশের স্বাধীনতার জন্য দারিদ্র্য বরণ, প্রাণ বিসর্জন ভাবপ্রবণতা মাত্র, ইহার মধ্যে সার্থকতা নাই ইহাই অমরসিংহের মত। নাট্যকার অমরসিংহের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "সে একটা সুন্দর অনুভূতিমাত্র; এই কয় বৎসরে মেবার বাসীরা ধনী, সুখী, সম্পদশালী হয়েছে। রাজ্যে একটা গভীর শান্তি বিরাজ কর্চ্ছে। শুদ্ধ একটা অনুভূতির খাতিরে এই সুখ-স্বচ্ছন্দতা হারাবো? যখন একটা নামমাত্র কর দিলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।" সামন্তরা রানাকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের কথার ভিতর দিয়া নাট্যকার দেশের জনচিত্তেও দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন মনে হয়। রানার উৎসাহহীনতা দেখিয়া গোবিন্দসিংহের অন্তর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল, "আমার এই ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে একটা ধূমায়মান মহত্ত্বকে আকাশে মিশিয়ে যেতে দেখেছি। সব গিয়েছে! আর কি আছে জয়সিংহ? এখন আছে সেই মহিমার শেষ রশ্মি। এখন দেখছি একটা ম্রিয়মাণ গৌরব মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ-নেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।"

কিন্তু সকলের ইচ্ছাকে তুচ্ছ করিয়া রানা মোগল দূতকে আহ্বান করিয়া সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যবতী সভাকক্ষে প্রবেশ করিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিল, "সামন্তগণ! তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজ। রাণা যদি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হন, আমি তোমাদের সেনাপতি হবো।" মুহূর্তে সমস্ত ওলোট-পালোট হইয়া গেল: সামন্তগণ এবং রানা বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না, সত্যবতী পুনরায় বলিল, "সামন্তগণ! রাণা উদয়সাগরের প্রাসাদ কুঞ্জে শুয়ে বিলাসের স্বপ্ন দেখুন। আমি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাব।"

গোবিন্দসিংহ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন, একখানি পিত্তল খণ্ড উঠাইয়া কক্ষস্থ বৃহৎ আয়নায় ছুঁড়িয়া মারিলেন—আয়নাখানি চূর্ণ হইল। সকল বিস্মৃত হইয়া গোবিন্দ রানাকে বাহুদ্বারা আকর্ষণ করিলেন। রানার চিত্তও নব প্রেরণায় জাগ্রত হইল, তিনি মোগল দূতকে জানাইলেন, "মোগল-দূত, আমরা যুদ্ধ করবো।"

গোবিন্দসিংহের আচরণ এবং অমরসিংহের অন্তরের উদ্বোধনের দৃশ্যটিও সম্পূর্ণরূপে টডকে অনুসরণ করিয়া রচিত। সত্যবতীর কোন কথা অবশ্য উক্ত গ্রন্থে নাই।

এই দৃশ্যে গোবিন্দসিংহের সহিত সত্যবতীর যোগে দেশাত্মবোধের পূর্ণ উদ্বোধন করা হইয়াছে। পরাধীন ভারতের জনচিত্তে প্রেরণা সৃষ্টি করিতে এই দৃশ্যটির বিশেষ তাৎপর্য আছে।

চতুর্থ দৃশ্য:

আগ্রায় মহাবৎ খাঁর গৃহ—কাল, মধ্যাহ্ন।

মহাবৎ ও আবদুল্লার সংলাপ। জানা গেল যে সম্রাটের ভাগীনেয় খাঁ খানান হেদায়েৎ আলি খাঁ ৫০ হাজার সৈন্য লইয়া মেবার আক্রমণ করিতে যাইতেছে। যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে মহাবৎ তাহা পূর্বেই জানাইয়া দিলেন। হেদায়েৎ বন্দুকের শব্দকে ভয় পায়, যুদ্ধ জানে না—সুতরাং তাহার পরাজয় নিশ্চিত। এই দৃশ্যে নাট্যকার আরও জানাইলেন যে মহাবৎ সম্রাটের আহ্বান সত্ত্বেও মেবার যুদ্ধে যাইতে স্বীকৃত হন নাই, মেবার তাঁহার জন্মভূমি—সুতরাং মেবার যুদ্ধ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। গুণহীন ব্যক্তিও যে

কেবল আত্মীয়তার জোরেও মর্যাদা পায় তাহা কেবল একালের ঘটনা নয় নাট্যকার তাহারও আভাস দিলেন।

টডের মতে খাঁ খানানের ভ্রাতা প্রথম মেবার আক্রমণ করে—নাট্যকার খাঁ খানানকেই সৈনাপত্য দিয়াছেন।

৫ম দৃশ্য :

মোগল শিবির—কাল, মধ্যাহ্ন।

হেদায়েৎ এবং কর্মচারী হুসেনের কথোপকথন।

হেদায়েৎ গর্ব করিয়া বলিল যে ভেড়ার পালের ন্যায় রাজপুতদের সে একেবারে কাবাব বানাইয়া দিবে। হুসেনের কথায় রাজপুতদের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই দৃশ্যে একটু হাস্যরসের চেষ্টা আছে, একস্থানে একটু ভাষার কৌশলও করা হইয়াছে—"বড় বড় হাতী গেলেন তলিয়ে! এখন "মশায়" কি করেন দেখা যাক্।" 'মশায়'—'মশা' এবং মহাশয় এই দুই অর্থেরই ইঙ্গিত করে।

৬ষ্ঠ দৃশ্য :

উদয়পুরের উদয়সাগরের তীর—কাল, প্রভাত।

মানসীর গানে মানবপ্রেমের পরিচয়—ভিখারিণীর সহিত কথায় তাহার প্রীতিসিক্ত হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। অজয়ের সহিত কথায় তাহার সেবা-ব্রতের সংবাদ পাঠক-দর্শক জানিতে পারে—মানসী একটি অতিথিশালা খুলিয়াছে এবং সেখানে গিয়া প্রত্যহ নিজের হাতে সে তাহাদের খাদ্য দিয়া আসে। অজয়সিংহ নিজের অন্তরের প্রেম মানসীকে নিবেদন করে এবং মানসী তাহাকে ভালোবাসে কিনা তাহা জানিতে চায় : মানসী উত্তর করে, "মানুষ মাত্রকেই ভালোবাসি"। অজয়ের প্রতি মানসীর ব্যক্তিগত বিশিষ্ট প্রেমের কোন পরিচয় এই দৃশ্যে নাই। অজয়সিংহ যুদ্ধে যাইতেছে শুনিয়াও তাহার কোন ভাবান্তর হয় না—যুদ্ধে হত হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া একবার সে মুখ নত করে মাত্র।

অজয় যুদ্ধ যাত্রা করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবার পর মানসীর আহত সৈন্যদের সেবা করিবার ইচ্ছা জাগে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অজয়সিংহের সৈন্যদলের সহিত সে সেবাব্রত লইয়া যাইবে বলিয়া স্থির করে। মাতার বাধা মানসী

অগ্রাহ্য করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়। রাণীর কথায় জানা যায় যে যোধপুরের রাজপুত্রের সহিত মানসীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল—কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনায় বিবাহের সমস্ত সম্ভাবনাই নষ্ট হইয়া গেল। অমরসিংহ যে উদার এবং দয়ালু মানসীর কথায় এই দৃশ্যে তাহা জানা গিয়াছে।

রাণীর সাহায্যে হাস্যরস স্বষ্টির প্রচেষ্টা এই দৃশ্যেও নাট্যকার করিয়াছেন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের কিছুমাত্র মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই, রাজপুত রমণী বলিয়াও তাঁহাকে মনে হয় না। হাস্যরস স্বষ্টির উদ্দেশ্যে রানার মহিষী-চরিত্রের এইরূপ পরিচয় দান নাটকের পক্ষে অত্যন্ত ত্রুটি হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে আরাবল্লীর অরণ্য-পর্বতে প্রতাপ-পুত্রবধূকেও নানা দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে।

মানসীর চরিত্রের ভিতর দিয়া বিশ্বপ্রেমের উদ্বোধন করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু চরিত্রটি রক্তমাংসের হইয়া উঠিতে পারে নাই। অজয়সিংহের প্রতি মানসীর যে প্রেমের পরিচয় পরবর্তীকালে পাওয়া যায় তাহার কোন আভাস অজয়ের প্রেম নিবেদনের পরেও মানসীর মধ্যে দেখা যায় নাই। যোধপুরের রাজপুত্রের সহিত বিবাহের সম্ভাবনার কথা শুনিয়াও তাহার এমন কোন ভাবান্তর দেখা গেল না যাহাতে মনে হয় যে সে অজয়ের প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট। সেই বিবাহের সম্ভাবনা নষ্ট হইতে বসিয়াছে শুনিয়া সে কেবলমাত্র বলিয়াছে, "নাই বা হ'ল? বিয়ে যদি না হয় ত কি হবে?"

মানসীর সমস্ত আচরণই কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। এই দৃশ্যে মানসীর গুণের পরিচয় প্রায় সমস্তটাই মানসীর মুখ দিয়াই নাট্যকার বলাইয়াছেন: ভিখারিণীর আশীর্বাদে সে সুখী—সকলেই যে তাহাকে আশীর্বাদ করে তাহা সে একদিন সকর্ণে শুনিতে চায়, যে অতিথিশালা সে খুলিয়াছে সেখানে প্রত্যহ গিয়া নিজের হাতে অতিথিদের আহার না করাইলে তাহার তৃপ্তি হয় না। যুদ্ধযাত্রার জন্য অজয় বিদায় লইয়া গেলে মানসী 'সহসা করতালি দিয়া' নিজের মনেই বলিয়াছিল, "বেশ! আমার কাজ আমি কর্বো, যারা যুদ্ধে মর্বে, তাদের আর কিছু কর্তে পার্বো না।—কিন্তু যারা আহত হবে, তাদের ত শুশ্রূষা কর্তে পারি। আমি তাই কর্বো।—কেন! কি আপত্তি! বেশ! তাই কর্বো।"—এই 'করতালি' দেওয়া এবং স্বগতোক্তি হাস্যকর। মাতাকে যখন সে বলে, "আমি বিবাহ করবার চেয়ে একটা মহৎ কাজ কর্বো ঠিক করেছি" অথবা "আমাকে জান ত, কর্তব্য যখন আমাকে

ডাকে, তখন আমি আর কারো কথা শুন্‌বার অবকাশ পাই না" তখন ইহাকে অর্বাচীনের উক্তি বলিয়া মনে হয়, অন্তরে এই কথার কোন স্পর্শ লাগে না। এই দৃশ্যে মানসীর শেষ কথা,—"এ ইচ্ছা কে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে? এর জ্যোতি আমার অন্তরের কোণে উঁকি মার্চ্ছিল এখন তার পূর্ণ মহিমায় আমার অন্তর ছেয়ে ফেলেছে। এ এক নবীন উৎসাহ! এ এক মহা আনন্দ! বিবাহ সুখের কি ক্ষুদ্র আয়োজন!"—একেবারে কৃত্রিম বলিয়াই কেবল মনে হয় তাহাই নহে, একটু যেন আত্মসচেতনতা, অহমিকার স্পর্শও ইহাতে লক্ষিত হয়।

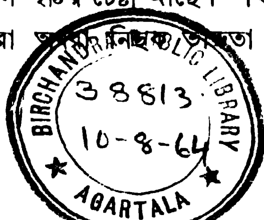
গোবিন্দসিংহ-সত্যবতীর মধ্য দিয়া নাট্যকার দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করিয়াছেন—মানসীর মধ্য দিয়া এইবার বিশ্ববোধের উদ্বোধন করিলেন। কিন্তু মানসীর আদর্শকে তিনি এখনও গোবিন্দ-সত্যবতীর আদর্শের বিরোধী করিয়া দেখান নাই। উভয় আদর্শের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টির ইচ্ছা এখনও পর্যন্ত নাট্যকারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মানসীর বিশ্বপ্রেমের পরিচয় দিয়াও নাট্যকার সেই জন্যই তাহাকে দিয়া বলাইয়াছেন, "অন্যায় অত্যাচার জগৎ ছেয়ে রয়েছে। তাদের দূর করবার জন্য যুদ্ধ অনেক সময় অনিবার্য হয়।" প্রথম অঙ্কে নাট্যকার দুই আদর্শের বিরোধ প্রদর্শন করেন নাই: চারিদিকে নাগিনীরা যখন বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলিতেছে তখন শান্তির 'ললিত-বাণী' যে 'ব্যর্থ পরিহাস' হইবে তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই।"

সপ্তম দৃশ্য:

মেবারের যুদ্ধক্ষেত্র—কাল, সন্ধ্যা।

হেদায়েৎ খাঁ এবং হুসেন। তাহাদের কথাবার্তার ভিতর দিয়া রাজপুত সৈন্যের অগ্রসর হইবার এবং মোগল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইবার কথা শোনা গেল। বীর এনায়েৎ খাঁ যুদ্ধে হত হইয়াছে। রাজপুত সৈন্য একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে'শুনিয়া হেদায়েৎ পলায়নের উদ্যোগ করিল এবং একটি গুলি লাগিয়া ভূপতিত হইল। অজয় হেদায়েৎকে যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়া শিবিরে আহত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া গেল।

হেদায়েৎ-এর সাহায্যে এখানে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা আছে। কিন্তু ভীরুর কথায় এবং আচরণের বৈপরীত্যের দ্বারা অথবা নিছক ভীরুতা প্রদর্শনের দ্বারা যে হাস্যরস সৃষ্টি হয় তাহা স্থূল।



দৃশ্যান্তরের সাহায্যে নাট্যকার যুদ্ধক্ষেত্রে মানসীর সেবা-কর্ম প্রদর্শন করিলেন। হেদায়েৎও তাহার সেবা লাভ করিল—শত্রু-মিত্র সকলেই তাহার নিকট সমান। হত্যার তাণ্ডব দেখিয়া মানসী নিজের মনেই বলিয়াছে, "পরমেশ! তোমার রাজ্যে এই নিয়ম, যে, মানুষে মানুষ খায়! এ হিংসার বন্যা কি পৃথিবী থেকে নেবে যাবে না?• মানুষ নির্বিবাদে মানুষকে হত্যা কর্চ্ছে, আর তুমি তাই নীরব হ'য়ে—দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ দয়াময়! নীল আকাশ ভেদ ক'রে বিশ্বে পাপের ভৈরব বিজয় হুঙ্কার উঠছে, আর এখনও তুমি তার গলা টিপে ধর্চ্ছ না!"

ইহার পূর্বে মানসীর মুখে শোনা গিয়াছিল, অন্যায় রোধ করিবার জন্য যুদ্ধেরও একটা অনিবার্য প্রয়োজন আছে। মেবার যুদ্ধ রাজপুতদের পক্ষে সেই অন্যায় প্রতিরোধের যুদ্ধ; কিন্তু মানসী সেই যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা দেখিয়া যে কথা বলিল তাহা সমস্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধেই তাহার অভিমত প্রকাশ। কিন্তু অন্যায় রোধ করিবার উপায় কি! স্বাধীনতার উপর যখন আক্রমণ হইবে তখন যুদ্ধ এড়াইবার জন্য পরাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়াই কি সমস্যার সমাধান? ভগবানের নিকট অভিযোগ জানাইয়া সমস্যা সমাধানের কোন্‌ পদ্ধতির সন্ধান করা হয়? ভগবান তো মানুষের মধ্য দিয়াই কাজ করেন—তবে এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ রোধের উপায় কি?

অষ্টম দৃশ্য :

উদয়পুরে অমরসিংহ প্রভৃতিকে লইয়া চারণ দলের বিজয় সঙ্গীত।

প্রথম অঙ্ক শেষ করিবার পর হয়তো যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা স্মরণ করিয়া দুঃখ হয়, অথচ দেশ রক্ষায় যুদ্ধ ব্যতীত উপায়ই বা কি? লেখকের উদ্দেশ্য সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ হইয়া পড়ে। দেশের কাজে আত্মত্যাগের জন্য যখন পাঠক-দর্শকের চিত্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করে ঠিক সেই মুহূর্তে যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা স্মরণ করিয়া হত্যার গ্লানির চিন্তায় তাহাদের সঙ্কুচিত হইতে হয় এবং ইহারই ফলস্বরূপ রস কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়ে। আক্রমণকারীকে প্রতিহত করিবার জন্য মেবারবাসীর চিত্তে যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া নাটকে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সার্থকতা সম্বন্ধেই যেন সন্দেহ জাগে। নাটক বিচারে ইহা ত্রুটি নিশ্চয়ই।

দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ

১ম দৃশ্য ঃ

আগ্রায় রাজা সগরসিংহের গৃহকক্ষ—কাল, প্রভাত।

সগর এবং তাঁহার দৌহিত্র অরুণ। সগরসিংহ মহর্ষি বাল্মীকির নামও শোনেন নাই—অথচ দৌহিত্র অরুণ রামায়ণ-বাল্মীকির কথা সবই জানে। দুইটি চরিত্রের স্বরূপ ইহাতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মোগলের নিকট সগরসিংহের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণরূপেই হইয়াছে, দেশের মহাকাব্যের কথা, ঐতিহ্যের কথা কিছুই তাঁহার জানা নাই, জানার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন না। অথচ মিথ্যা যুদ্ধের গৌরব অর্জনের চেষ্টারও তাঁহার ত্রুটি নাই। অপর-দিকে, দাদামশায়ের নিকটে বাল্যকাল হইতে থাকিয়াও অরুণসিংহ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল—সে যে মেবারকে ভালবাসে তাহার প্রমাণ এইখানেই।

দুই জনে কথোপকথনে রত এমন সময় মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ আব্দুল্লা আসিয়া জানাইল যে সম্রাট সগরসিংহকে চিতোরের রানার পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। অমরসিংহের সহিত যুদ্ধের ভয়ে সগর এই পদ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছুক হইলেন না ঃ আব্দুল্লা জানাইল যুদ্ধ যাহা কিছু করিবার তাহা মোগল সৈন্যই করিবে, সগর কেবল রানা হইয়া বসিবেন। আব্দুল্লা সগরকে সম্রাটের নিকট লইয়া গেল—সগর এইরূপ ব্যবস্থা অন্যায় এবং ইহা এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা এই কথা বলিতে বলিতে সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে চলিলেন।

এইখানে টডের ইতিহাসের ছায়া আছে। অরুণের প্রশ্নের উত্তরে সগর জানাইয়াছিলেন যে অরুণের পিতা মহারাজ গজসিংহের সঙ্গে গুজরাটের যুদ্ধে গিয়া হত হন। টড বলিয়াছেন মহারাজ গজসিংহ গুজরাট আক্রমণ করিতে গিয়া সেইখানেই নিহত হন। টড আরও বলিয়াছেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্রাট সগরসিংহকে চিতোরের রানা করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দেন, নাটকেও সেই ঘটনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই দৃশ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিষয়টুকুও নাট্যকারের মনোভাবের স্পর্শে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিয়া মুসলমান করিয়া লয় অথচ হিন্দুরা মুসলমানকে হিন্দু করা দূরে থাক—'যারা একবার

কারে পড়ে' মুসলমান হয়, তাদেরও তারা আর ফিরে নেবে না। ঐ জায়গাটাতেই হিন্দুরা ভুল করেছে।' নাট্যকার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই হিন্দুর গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তবে অতিরিক্ত সংখ্যায় হিন্দুর মুসলমান হইয়া যাওয়া যে তিনি সমর্থন করেন নাই তাহা নিশ্চিত।

২য় দৃশ্য :

উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর—কাল, প্রভাত।

মানসীর সংগীত সমাপ্ত হইবার পর অজয়সিংহ প্রবেশ করিল। উভয়ের সংলাপের ভিতর দিয়া মানসীর অন্তরে যে বিশ্বমৈত্রীর সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহা প্রকাশ হইল—মানুষ দুর্বল, সামান্য আঘাতেই তাহারা মৃত্যু বরণ করে তথাপি পরস্পরকে তাহারা ভালবাসেনা কেন ইহাই মানসীর নিকট বিস্ময়জনক। অজয় মানসীর মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে পাইল, সে স্পষ্ট করিয়াই জানাইল যে মানসী স্বর্গের দেবী—তাহাকে সে আর পাইবার আশা করে না "আমি আর তোমায় ভালবাসা দিতে পারি না। ভক্তি দিতে পারি৷" মানসীর একখানি হাত হাতের মধ্যে লইয়া সে নিজ অন্তরের ভক্তির বিনিময়ে মানসীর একবিন্দু করুণা ভিক্ষা করিল। এই নাটকীয় মুহূর্তে রাণী উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "অজয়সিংহ!" রাণী মানসী ও অজয়কে সাবধান করিয়া দিলেন, মানসীর সহিত অজয়ের সাক্ষাৎ আর বাঞ্ছনীয় নহে তাহাও জানাইয়া দিলেন—অজয় বিদায় গ্রহণ করিল। অজয়ের প্রতি রাণীর অন্তরে প্রীতির অভাব ছিল না। কিন্তু মানসী যে রাজকন্যা! অজয়ের সহিত তাহার বিবাহ অসম্ভব।

এইবার রানা ও রাণীর সংলাপ। রানার ধারণা মানসী "স্বর্গের একটা রশ্মি দয়া করে' মর্তে নেমে এসেছে।" রাণী প্রাস্থান করিলে রানা বেদীর উপর বসিয়া চিন্তা করিতে বসিলেন—জীবনটা এখন তাঁহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।

গোবিন্দসিংহ আসিয়া পুনরায় মোগল সৈন্যের আগমন সংবাদ জানাইলেন, অমরসিংহ আর যুদ্ধ করিবেন না। তিনি জানিতেন মোগল সৈন্য তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় আসিয়া পড়িবে—মেবারের কিছুতেই রক্ষা নাই। গোবিন্দসিংহ রানাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেন না। এইবারও

সত্যবতী অসাধ্য সাধন করিল। অসংখ্য বীরের রক্ত দিয়া জয় ক্রয় করিতে রানা অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সত্যবতী দৃঢ়কণ্ঠে জানাইল, "বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে! দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে, দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।" সত্যবতী আত্মপরিচয় দান করিল। রানা যুদ্ধের জন্য সৈন্য সজ্জিত করিতে গোবিন্দ-সিংহকে আদেশ করিলেন।

এই দৃশ্যে মানসীর বিশ্বমৈত্রীর পাশাপাশি সত্যবতীর দেশপ্রেম স্থাপন করা হইয়াছে। মানসীকে স্বর্গের দেবী বলিয়া রানা মনে করেন ; আকাশের দিকে চাহিয়া রানার মনে জগতের সম্বন্ধে এক বিশেষ তত্ত্ব জাগ্রত হইয়াছে। যে রানাকে প্রথম অঙ্কে বিলাসী বলিয়া যুদ্ধ যাত্রায় অনিচ্ছুক মনে হইয়াছে—সেই রানার মধ্যে এই দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যুদ্ধ বিমুখতার আরও গভীর কারণের সন্ধান পাওয়া গেল। অসংখ্য মানুষের জীবনের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয় সে স্বাধীনতা মূল্যহীন, বিশেষ তিনি জানেন যে সেই স্বাধীনতা রক্ষাও কিছুতেই সম্ভব হইবে না। রক্তপাত নিছক ভাবের চরিতার্থতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। পাঠক-দর্শক রানার কথায় সত্যই দ্বিধাগ্রস্ত, রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার সার্থকতা আছে কি ? আজ স্বাধীনতা রক্ষা করা গেলেও কিছু দিনের মধ্যেই যখন তাহা নিশ্চিতই যাইবে তখন দ্বিধা আরও বিশেষরূপে অন্তর আলোড়িত করে। আবার সত্যবতীর কথা শুনিয়া মনে প্রবল ভাবাবেগের সঞ্চার হয়। উন্মত্ততা হইলেও প্রবল শত্রুর বিরোধিতা করিতেই ইচ্ছা করে, সত্যই মনে হয় "উন্মত্ত না হ'লে কেউ কোনকালে কোন মহৎ কাজ কর্তে" পারে না। নাট্যকার কোনদিকে যে পাঠক-দর্শকদের লইয়া যাইতে চাহেন তাহা বোধগম্য হয় না। মানুষ দেশ রক্ষায় প্রাণ দিবে, না মানুষ রক্ষায় দেশ দিবে! একটি মানুষের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে এবং সেই দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে নাটকও সৃষ্টি হইতে পারে ; কিন্তু নাট্যকার নিজে যদি লক্ষ্যচ্যুত হইয়া নাটকের হাল ধরিতে না পারেন তাহা হইলে রস গাঢ় হইয়া উঠিতে পারে না।

এই দৃশ্যের আর একটা ত্রুটি রানা এবং সত্যবতী বহুক্ষণ ধরিয়া কথা বলিয়াছে কিন্তু গোবিন্দসিংহ উপস্থিত থাকিয়াও কিছু বলিবার অবকাশ পান নাই। মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়াও গোবিন্দসিংহের কোন

কিছু করিবার ছিল না—কোন পাত্র-পাত্রীকে এইরূপ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে স্থাপিত করা নাটকের পক্ষে ত্রুটি সন্দেহ নাই।

সগরসিংহ চিতোরের রানা হইয়া বসিয়াছেন নাট্যকার সুকৌশলে তাহা সত্যবতীকে দিয়া জানাইয়া দিলেন। সত্যবতীরই চেষ্টায় সগর কোন সামন্তের আনুগত্য পান নাই—সম্রাটের যে বিভেদ সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তাহা এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল।

এই দৃশ্যেই সত্যবতীর পরিচয় উদ্ঘাটন করিয়া নাট্যকার কিছুটা নাটকীয়তা সৃষ্টি করিয়াছেন: ইহার পরে সত্যবতীর সগরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেইখানেই সত্যবতীর পরিচয় পাওয়া যাইত—কিন্তু তাহাতে নাটকীয়তা সৃষ্টি হইত না। সত্যবতী অমরসিংহ-গোবিন্দ সিংহেব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, তাঁহাদের নিকটই তাহার পরিচয় উদ্ঘাটন সার্থক হইয়াছে।

৩য় দৃশ্য :

মেবারে সায়েদ আব্দুল্লার শিবির—কাল, রাত্রি।

এইবার মোগল সেনাপতি হইয়া আসিয়াছে আব্দুল্লা, সেও দুর্বল চিত্ত—হেদায়েৎ অপেক্ষা অধিক রণকুশলীও নয়। আব্দুল্লা-হেদায়েৎ-হুসেনের কথাবার্তার ভিতর দিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরস সৃষ্টির এই কৌশলটিই মাত্র অবলম্বন করিয়াছেন। হাস্যরস হিসাবে ইহা একেবারেই সার্থক নয়। তাহাদের কথাবার্তা চলাকালেই মেবার সৈন্য সেই রাত্রিতেই মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া বসিল—আব্দুল্লাও সৈন্য সজ্জিত করিতে আদেশ করিল।

৪র্থ দৃশ্য :

চিতোর দুর্গাভ্যন্তর—কাল, রাত্রি।

একটি শয্যায় ঘুমন্ত অরুণ, অপর শয্যা শূন্য। সগরসিংহ চিন্তান্বিত অবস্থায় পায়চারী করিতেছেন। সগরের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তিনি ইহারই মধ্যে রামায়ণ পড়িয়া ফেলিয়াছেন, পূর্বপুরুষদের গৌরব কথাও চারণ-চারণীদের মুখে শুনিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন। চিতোরের দুর্গ তাঁহাকে পূর্বস্মৃতিতে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তিনি ভীমসিংহ, জয়মল, প্রতাপের

ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন : মনে হইল তাঁহাকে যেন কাহারা বধ করিতে আসিতেছে। সগর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

টডের গ্রন্থে এই কাহিনী আছে। নাট্যকার সেই কাহিনী অবলম্বনে চমৎকার নাটকীয়তা সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা অতিনাটকীয় হইয়া উঠিতে পারিত তাহাই নাট্যকারের সংযত তুলিকার স্পর্শে অপূর্বভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে।

৫ম দৃশ্য :

উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর—কাল, মধ্যাহ্ন।

মানসী ও কল্যাণী। মানসী কুষ্ঠাশ্রম করিয়াছে, সকলের জন্য সে বেদনা অনুভব করে—তাহার কণ্ঠে বিশ্বমৈত্রীর বাণী, "পরকে সুখী ক'রেই প্রকৃত সুখ। নিজেকে সুখী কর্বার চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়।" কথায় কথায় অজয়ের কথা ওঠে, মানসীর অন্তরের গোপন প্রেমের পরিচয় যেন আভাসিত হয়, "আমি তাঁকে—আমার তাঁকে বড়ই দেখ্‌তে ইচ্ছা করে!"

আগ্রা হইতে এক ছবিওয়ালী আসিয়াছে, মানসী তাহার নিকট হইতে কয়েকটি ছবি ক্রয় করে—মহাবতের ছবি তাহাদের অন্যতম। কল্যাণীকে সে মহাবতের ছবিটি দান করে। কল্যাণীর মনে সন্দেহ ছিল যে বিধর্মী স্বামীকে ভালবাসা হয়তো পাপ। মানসী তাহার সংশয় দূর করিয়া দিল—"তিনি যদি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম না বলে' আল্লা বলেন, তাতে কি তিনি এই ভাষার ভোজবাজিতে পাপী হ'য়ে গেলেন?" মানসী আরও বলিল, "প্রেমের রাজ্যে সুন্দর কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই, প্রেমের রাজ্য পার্থিব নয়।"

মানসীর মুখে যে সব কথা নাট্যকার বসাইয়াছেন তাহা যেন তাহার মুখে অসংগত ঠেকে। একটি বালিকা উচ্চতত্ত্ব কথা জানিল কেমন করিয়া? তাহাকে রক্তমাংসের মানুষ বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। চরিত্রটির সংগতি রক্ষা হয় নাই বলিয়া সংশয় জাগে। নাট্যকার নিজেও তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পূর্বেও তাই আভাস দিয়াছেন যে মানসী স্বর্গের দেবী—এই দৃশ্যেও আর একবার তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

কল্যাণীর বিদায় গ্রহণের পর রাণী আসিয়া মানসীকে তাহার বিবাহের দিন স্থির হইতেছে এই সংবাদ দিলেন। মানসী জানাইয়া দিল, "পরিণয়ের

গণ্ডীর মধ্যে আমার জীবনকে আবদ্ধ করে' রাখ্‌বো না। আমার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়।" শঙ্কিত রাণী রানাকে সেই কথা বলিলেন। রানা উত্তর করিলেন, "রাণী! আমিই যে খুব বুঝতে পার্চ্ছি, তা নয়। তবে এটা বুঝেছি যে এটা একটা স্বর্গীয় কিছু।" বার বার এই স্বর্গীয় ভাবের সংবাদ দিয়া পাঠক-দর্শকদের দ্বারা নাট্যকার মানসীর অসংগতি সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য :

গোবিন্দসিংহের গৃহের অন্তঃপুর—কাল, মধ্যাহ্ন।

কল্যাণী স্বামী মহাবৎ খাঁর দেওয়ালে লম্বিত চিত্রটি পূজা করিতেছিল এমন সময় গোবিন্দসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গোবিন্দ মহাবৎকে বিধর্মী বলিয়া পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করেন, কল্যাণী স্বামী বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে চাহে—"তাঁর সঙ্গে যদি এর জন্য নরকে যেতে হয়, তাও আমি যেতে প্রস্তুত।" গোবিন্দসিংহ কল্যাণীকে পরিত্যাগ করিলেন, অজয় ভগ্নীকে দোষী মনে করিতে পারিল না—সে তাহাকে রক্ষার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিয়া গেল। গোবিন্দসিংহ পাষাণবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কল্যাণীর স্বামীপ্রেম এবং গোবিন্দের দেশপ্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্বটি নাট্যকার সুন্দর ভাবে সাজাইয়াছেন। হিন্দু নারী সমস্ত অবস্থাতেই স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে—কল্যাণীও যে তাহাই মনে করিবে তাহাতে কোন বিস্ময় নাই। গোবিন্দসিংহও তাহার জীবনের পঁচিশ বৎসর মোগলের সহিত যুদ্ধে কাটাইয়া চরম দুঃখ স্বীকার করিয়াছেন, তাই যে রাজপুত ধর্মত্যাগ করিয়া মোগলের দাস হইয়াছে তাহাকে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। ইহাকে গোবিন্দসিংহের নিছক মুসলমান বিদ্বেষ বলিলে চলিবে না—ইহা আক্রমণকারী শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ। বিশেষ, বর্তমানেও দুইবার পরাভূত হইয়া একলক্ষ সৈন্য লইয়া সাহাজাদা পরভেজ যখন পুনরায় মেবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছে তখন মেবার সেনাপতির পক্ষে মুসলমানের প্রতি সহানুভূতি অসম্ভব।

কল্যাণীর কথাগুলি অনেকক্ষেত্রেই অত্যধিক ভাবাবেগে অতিনাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। একটি স্থানে নাট্যকার তাহার মুখে যে কথা বসাইয়াছেন

তাহা মোটেই শোভন হয় নাই—"দাদা, তুমি আমার ভাই বটে!"—কথাটার মধ্যে অহমিকার সন্ধান পাওয়া যায়।

অজয়ের মনে মানসীর স্পর্শ লাগিয়াছে, তাই রাজপুত যোদ্ধা হইয়াও সে মুসলমান বিদ্বেষী নয়—'হিংস্র নরসঙ্কুল সংসারের মাঝখানে' ভগ্নীকে সে একা ছাড়িয়া দিতে পারিল না।

৭ম দৃশ্য :

চিতোরের সন্নিহিত অরণ্য—কাল, সন্ধ্যা।

সগর চিতোর দুর্গ ত্যাগ করিয়া আগ্রায় যাইতে চাহেন. অরুণ চিতোরে পূর্বপুরুষদের স্মৃতি অনুভব করে—সে চিতোর ছাড়িয়া যাইবে না। দাদা-মহাশয়ের সকল প্রলোভন প্রদর্শন সে তুচ্ছ করিয়া দিল। বিশেষত সে জানে যে চিতোরে তাহার মা আছে—তাহাকে সে সন্ধান করিয়া বাহির করিবে। অরুণ দাদামহাশয়ের মোগল-পদলেহন প্রবৃত্তির তীব্র নিন্দা করে। সত্যবতী অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিল—পুত্রের দেশপ্রেমের পরিচয় পাইয়া প্রকাশ্যে বাহির হইয়া আসিল। মাতা-পুত্রের মিলন হইল—সগরেরও আজ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তিনিও দেশের জন্য দুঃখ বরণের প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই দৃশ্যে সত্যবতী এক সঙ্গে পিতা এবং পুত্রকে ফিরিয়া পাইল।

অরুণের কথা—"মোগলের পদতলে ব'সে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে আমার দীনা জননীর কোলে বসে' শাকান্ন খাওয়া ভাল!" অথবা, "পরের দত্ত স্বর্ণ ভাণ্ডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটিও মিষ্টি।"—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং মধুসূদনকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই অঙ্কেও নাট্যকারের উদ্দেশ্য সঠিক বোধগম্য হয় না। দ্বিতীয় দৃশ্যে রানা এবং সত্যবতীর চিন্তার বিরোধ, পঞ্চমদৃশ্যে কল্যাণীকে মানসীর উপদেশ, ষষ্ঠ দৃশ্যে কল্যাণী এবং গোবিন্দসিংহের মত-পার্থক্য আবার সপ্তম দৃশ্যে অরুণ-সত্যবতীর দেশাত্মবোধ—এই সকল কিছুর মধ্যে আদর্শের বিরোধ লক্ষিত হয়। মানুষ হিসাবে সকলকেই যদি ভালবাসিতে হয় তবে দেশের জন্য হত্যা কেন? আবার দেশপ্রেমকে যদি প্রাধান্য

দিতে হয় তবে হত্যা না করাই বা সম্ভব কি উপায়ে? হয়তো নাট্যকারের বলিবার ইচ্ছা ছিল যে সকলকে ভালবাস কিন্তু প্রয়োজন হইলে অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে অস্ত্রধারণও কর। যে মেবার আক্রমণের মধ্যে মুসলমানের হিংস্র জিঘাংসা প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাকে উপজীব্য করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের প্রচেষ্টা অসম্ভব।

তৃতীয় অঙ্ক ঃ

১ম দৃশ্য ঃ

উদয়পুরের সভাগৃহ—কাল, প্রভাত।

সাহাজাদা পরভেজের সহিত যুদ্ধে রানা জয়ী হইয়াছেন, সামন্তগণ আনন্দিত গৌরবান্বিত। রাজকবি কিশোরদাস জয়গীতি করিলেন। কিন্তু রানা বিষাদাচ্ছন্ন, তিনি মনে করেন যে, সবাই তাঁহার পাপে নষ্ট হইবে। যুদ্ধ জয় করিতে গিয়া যে অসংখ্য বীরের মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহাতে রানা শোকাচ্ছন্ন। সত্যবতী আসিয়া মেবারের গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করাইয়া রানাকে উৎসাহ দিয়া সুসংবাদ শুনাইল, "রাণা সগরসিংহ—আমার পিতা, রাণার হস্তে চিতোর দুর্গ ছেড়ে দিয়েছেন। রাণা নির্বিবাদে গিয়ে সেই দুর্গ অধিকার করুন।" রানা অত্যন্ত আনন্দবোধ করিলেন, উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "সামন্তগণ! জয়ধ্বনি কর। স্বর্গীয় পিতার জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে—তাঁর পুত্রের বাহুবলে নয়, তাঁর ভ্রাতার দানে। দুর্গ অধিকার কর—সেনাদল গঠন কর, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কর।"

যুদ্ধে জয়লাভ সত্ত্বেও অমরসিংহকে বিষাদাচ্ছন্ন দেখা গিয়াছে। তাঁহার কোন্ পাপে সবাই নষ্ট হইবে তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই ঃ যুদ্ধ জয় করিতে গিয়া যে হাজার হাজার রাজপুত বীরের মৃত্যুর কারণ তিনি হইয়াছেন ইহাই হয়তো তাঁহার পাপ। কিন্তু পরমুহূর্তেই চিতোর দুর্গ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি সেনাদল গঠন করিয়া চিতোর দুর্গ অধিকার করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন। অমরসিংহের যে জীবনদর্শনের আভাস দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত তাহার এই আচরণের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য করা যায় না। তিনি মেবার দুর্গ অধিকার করিতে নিশ্চয়ই প্রস্তুত হইবেন কিন্তু এত অধিক উৎসাহ প্রদর্শন তাঁহার চরিত্রের উপযুক্ত নয়।

২য় দৃশ্য :

গ্রাম্য পথ-পার্শ্বে একখানি অর্ধভগ্ন কুটীর—কাল, সায়াহ্ন।

কল্যাণী ও অজয় পথ দিয়া চলিয়াছে। কল্যাণী আর হাঁটিতে পারিতেছে না—সেই ভগ্ন কুটিরেই সে আশ্রয় গ্রহণ করিল : আলো এবং খাদ্য আনিতে অজয় গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া গেল। এমন সময় সগরসিংহ সেখানে উপস্থিত হইলেন, পাছে মুসলমান সৈন্য অত্যাচার করে তাই অজয়ের ফিরিয়া আসা পর্যন্ত কল্যাণীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সগর সেখানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশঙ্কা সত্য হইল—মুসলমান সৈন্য না হইলেও কয়েক-জন মুসলমান দস্যু কল্যাণীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। সগর তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আহত হইলেন। ইত্যবসরে অজয় আসিয়া যুদ্ধ করিয়া কয়েকজন দস্যুকে আহত করিল, বাকি সকলে পলায়নপর হইল। সগব সিংহের সহিত অজয়-কল্যাণীর পরিচয় হইল—সগর পুত্রবধূর সমস্ত সংবাদ পাইলেন।

এই দৃশ্যটি আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনহীন, দৃশ্যটির ত্রুটিও কম নয়। পরভেজ পলাতক, মোগলরা পুনরায় আক্রমণও করে নাই, সুতরাং মোগল সৈন্যের দৌরাত্ম্য ওইদিকে হইবার কারণ নাই। দস্যুর আক্রমণ অবশ্য হইতেই পারে, কিন্তু মোগল-রাজপুতের যুদ্ধের কালে উদয়পুরের গ্রাম্যপথের পার্শ্বে দস্যুর উপদ্রব রাজপুতের পক্ষে কিছুমাত্র গৌরবের নহে। তবে দৃশ্যটির একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। সগরসিংহ পুত্রবধূর বিপদের কথা শুনিয়াছেন, পুত্রকে সেই নারীর আদর্শের কথা শুনাইতে গিয়াই তিনি পুত্রকে হিন্দু-বিদ্বেষী করিয়া ফেলিলেন। জন্মভূমি মেবার আক্রমণ করিতে মহাবৎ খাঁ অসম্মত ছিলেন—পিতার নিকট স্ত্রীর বিপদের কথা শুনিয়াই তিনি মেবার আক্রমণ করিতে স্বীকৃত হন। সুতরাং পরবর্তী চতুর্থ দৃশ্যে মহাবৎকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার জন্য এই দৃশ্যটির নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। সগরসিংহের আগ্রা যাইবার পথেই কল্যাণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

৩য় দৃশ্য :

যোধপুরের মহারাজ গজসিংহের কক্ষ—কাল, প্রভাত।

অরুণ দূতরূপে গজসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র যশোবন্ত সিংহের সহিত মানসীর বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছে। গজসিংহ অমরসিংহকে সম্রাটের বিদ্রোহী

বলিয়া মনে করেন সুতরাং এ বিবাহে তিনি অসম্মত। অরুণ গজসিংহকে কঠিন কথা শুনাইয়া দিল—স্বাধীন রানার গৌরব মোগল-পাদুকালেহীর নিকট নিশ্চয়ই অসহনীয় হইবে। অরুণের বিশ্বাস এইবার মেবার আক্রমণে সম্রাট গজসিংহকেও প্রেরণ করিবেন—অরুণ পূর্বাহ্নে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল। গজসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র অমরকে দূতরূপী অরুণকে বন্দী করিতে আদেশ করিলেন—অমরসিংহ সে আদেশ অমান্য করিল। গজসিংহ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ত্যাগ করিয়া যশোবন্তকে সিংহাসন দিবেন বলায় দৃপ্ত কণ্ঠে অমর উত্তর দিল, "আপনার আবার রাজ্য! মোগলের পদাঘাত আর করুণা একত্রে গলিয়ে আপনার যে সিংহাসনখানি তৈরী হয়েছে, সে সিংহাসনে বস্‌বার জন্য আমি আদৌ লালায়িত নই।" অমরকে গজসিংহ নির্বাসন দিলেন—অমরও সানন্দে সে আদেশ গ্রহণ করিল, অরুণকেও আর গজসিংহ বন্দী করিলেন না।

গজসিংহের ক্রোধ উজ্জীবন ব্যতীত এই দৃশ্যের অন্য প্রয়োজন ছিল না। গজসিংহ মোগলের দাস বলিয়াই মেবারের স্বাধীন রানাকে ঈর্ষা করিতেন; নিজে দাস হইলে সকলেরই সেইরূপ দাসত্ব বরণকেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। গজসিংহের মোগলের পদাঘাত অপমানজনক বলিয়া মনে হইত না, কিন্তু মেবারের সামান্য কথাতেই মনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। অরুণের কথায় তাই তিনি অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন—মেবার আক্রমণ বিষয়ে নিজেই বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিলেন—পরবর্তী দৃশ্যে তাই তিনি নিজে মহাবতের নিকট আসিলেন।

৪র্থ দৃশ্য :

মহাবৎ খাঁর বহিঃকক্ষ—কাল, রাত্রি।

মহাবৎ কল্যাণীর কথা ভাবিতেছিলেন। কল্যাণীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয় নাই, তিনি কল্যাণীর নিকট ক্ষমা চাহিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন। এই সময় গজসিংহ আসিলেন—মহাবৎ গজসিংহকে ঘৃণা করিতেন। গজসিংহ জানাইলেন যে মেবার যুদ্ধে যাইবার জন্য সম্রাট মহাবৎ খাঁকে আহ্বান জানাইয়াছেন, নিজেও তাঁহাকে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন এবং নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন।

সগরসিংহ সন্ন্যাসী বেশে প্রবেশ করিয়া পুত্র মহাবৎকে নিজের পরিবর্তনের কথা জানাইলেন এবং পুত্রকেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। মুসলমান

ধর্ম গ্রহণ করাকে মহাবৎ পাপ বলিয়া মনে করেন না। সগর হিন্দু ধর্মের উদারতার কথা ঘোষণা করিলেন। মহাবতের জন্য কল্যাণী গোবিন্দসিংহের গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে শুনিয়া মহাবৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি মেবার আক্রমণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, গজসিংহকে জানাইলেন—"আমি যাব হিন্দুত্ব ধ্বংস কর্তে। আপনাদের সমস্ত জাতিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্বো। তার উচ্ছেদ কর্বো।"

পঞ্চাঙ্ক নাটকে বিধিমত তৃতীয় অঙ্কেই সংঘাত চরম সীমায় পৌছায়ঃ ৩য় অঙ্কের এই ৪র্থ দৃশ্যটিকেই নাটকের দ্বন্দ্বের চরমসীমা বলা বিধেয়। মহাবৎ মেবার আক্রমণে বার বার অস্বীকার করিয়াছেন—এতাবৎকাল পর্যন্ত ভীরু-অজ্ঞ সেনাপতিরা মেবার আক্রমণ করিয়াছে, সুতরাং প্রকৃত যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। এইবার মেবার যুদ্ধ চরম পর্যায়ে পৌছিবে।

মহাবতের চরিত্র জটিল হইয়া উঠিয়াছে। গজসিংহকে তিনি কাপুরুষ অধম হীন মোগলের স্তাবক বলিয়া মনে করেন কিন্তু নিজে প্রতাপসিংহের ভ্রাতস্পুত্র হইয়াও মোগলের প্রধান সেনাপতি বলিয়া পরিচিত। হীনতা-কাপুরুষতা না থাকিলেও মোগলের প্রসাদভোজী তিনি নিজেও। গজসিংহ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই কিন্তু তিনি তাহাও করিয়াছেন—হিন্দুধর্মের সত্যকার পরিচয় না পাইয়াও তিনি ধর্ম ত্যাগ করিতে দ্বিধা করেন নাই। হিন্দুর কুসংস্কার আছে, কিন্তু মুসলমানেরও জোর করিয়া হিন্দু করাইবার চেষ্টার মধ্যে ধর্মের ঔদার্যের পরিচয় নাই। সুতরাং নিজেকে সমর্থন করিবারও মহাবতের কিছু ছিল না।

নাট্যকারের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও এই দৃশ্যে স্পষ্ট হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের, উভয়ের ধর্মই মহৎ, কিন্তু আচার-আচরণে উভয় ক্ষেত্রেই ত্রুটি আছে। কল্যাণীর প্রেম মহাবৎ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। প্রত্যাখ্যানের কারণ কি হইতে পারে? মহাবতের অহঙ্কার অথবা মেবারের রাজপুতকে অশ্রদ্ধা। মুসলমান ধর্ম যদি অহঙ্কার দূর না করিতে পারে, যদি হিন্দুর প্রতি অশ্রদ্ধা দূর না করিতে পারে তবে তাহাকে হিন্দু ধর্ম অপেক্ষা মহত্তর বলিবার কারণ কি? মহাবৎ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুর "ঘৃণা মুসলমান সুদ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে"। মহাবৎ হিন্দুত্ব ধ্বংস করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন—সুতরাং যদি আচরণের বিচার করিয়া রায় দিতে হয় তবে মহাবতের কথা বা আচরণ কোনটাই মুসলমান ধর্মকে উদার বলিয়া প্রমাণ করে না।

বিধর্মীকে নিজের বুকে টানিয়া লইবার ইচ্ছার মধ্যে মুসলমানের সামাজিক বুদ্ধির পরিচয় মাত্র আছে, ইহা ধর্মের উদারতা নহে।

গোবিন্দসিংহ কল্যাণীকে ত্যাগ করিয়া হয়তো কুসংস্কারাচ্ছন্নতার পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু কল্যাণী যে স্বামীর জন্য দুঃখ বরণ করিয়া লইল তাহাও হিন্দুর পত্নীত্বের আদর্শের প্রেরণাতেই। সগরসিংহের মুখ দিয়া নাট্যকার হিন্দু ধর্মের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হিন্দুধর্মের "মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়; সে ধর্মের চরম বিকাশ সর্বভূতে দয়া।"

সুতরাং নাট্যকারের উদ্দেশ্যেরও এইখানে চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে—হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মই মহৎ—আচার-আচরণের মাঝে ভ্রান্তি দেখা দেওয়াতেই সংঘাত দেখা দিয়াছে। কেহ আক্রমণ করিবে না, পরস্পরের আচরণ সংযত হইলেই তাহাদের মিলন সম্ভব।

টডের গ্রন্থে এই আক্রমণে মহাবতের উল্লেখ নাই। সেনাপতি সাহাজাদা সাজাহানই যুদ্ধ জয় করেন।

৫ম দৃশ্য:

জাহাঙ্গীরের সভা—কাল, প্রভাত।

যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য সম্রাট ক্ষুব্ধ—সগরসিংহ প্রবেশ করিলেন। সম্রাটের অভিযোগের উত্তরে সগর জানাইলেন যে চিতোর ন্যায়তঃ রানা অমরসিংহের প্রাপ্য বলিয়াই তিনি তাহা অমরকে দিয়া আসিয়াছেন। সম্রাট তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন—সগর আত্মহত্যা করিলেন।

সগরের কথায় কিছু মেলোড্রামার ভাব দেখা গিয়াছে। অধঃপতিত মানুষের অন্তর-ও যে মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইতে পারে তাহার প্রমাণ সগরসিংহ।

সগরের কাহিনী গ্রন্থনে কিছু দুর্বলতা আছে। তাহার আগ্রায় আসার অর্থই মৃত্যুবরণ—সত্যবতী-অরুণ তাঁহাকে না ছাড়িয়া দিলেই পারিত। মহাবৎকে পরিবর্তনের চেষ্টা হয়তো তিনি করিবেন, আগ্রা গমনের এইটুকু মাত্র সার্থকতা ছিল: কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও তাঁহাকে কি করিয়া অরুণ-সত্যবতী যাইতে দিল! বিশেষ অমরসিংহের পার্শ্বে সগরসিংহ আসিয়া দাঁড়াইলে মেবারের গৌরব বৃদ্ধি হইত নিশ্চয়ই। নাট্যকার মহৎ মৃত্যু প্রদর্শনের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সগরকে আগ্রায় টানিয়া আনিয়াছেন।

মানুষের সমস্ত সমস্যার মূলে স্বার্থবোধ এই কথাটা এই অঙ্কে নাট্যকার আভাসিত করিয়াছেন। সগরসিংহ সম্রাটকে জানাইয়াছেন, "পৃথিবীতে দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম স্বার্থ, আর একটির নাম ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটির জন্মস্থান স্বর্গ। একটির দেবতা শয়তান আর একটির দেবতা ঈশ্বর"। ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে মানুষে-মানুষে পার্থক্য ওই স্বার্থবোধই করিয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংঘর্ষের মূলে ধর্ম নয়—মানুষের দম্ভ। হিন্দু-মুসলমানকে নাট্যকার এই অঙ্কে এই কথাটাই বুঝাইয়াছেন। এই অঙ্কেই নাটকের দ্বন্দ্ব চরমে তুলিয়া, আবার এই অঙ্কেই সমস্ত দ্বন্দ্ব সমাধানের ইঙ্গিত করিয়া নাট্যকার নাট্য এবং কাব্য কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন।

চতুর্থ অঙ্ক :

১ম দৃশ্য :

উদয়সাগরের তীর—জ্যোৎস্না রাত্রি।

রানা একটি বেদীতে বসিয়া প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং হোরির আনন্দ-উৎসব দেখিতেছেন। সংসার তাঁহার নিকট মায়া বলিয়া মনে হইল—প্রকৃতির সৌন্দর্য সৃষ্টি কেবল মানুষ গুলিকে দুঃখ ভুলাইয়া রাখার ছলনা মাত্র। মানসী কিন্তু সে-কথা স্বীকার করিল না। পৃথিবী যদি মায়াও হয় তবে সেই মায়াও চমৎকার। মানসী মনে করে যে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যই মানুষকে সুন্দর সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে। রানার বিশ্বাস মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া উঠিয়াছে—তাহার মন লোভ-হিংসা-দ্বেষে বিষাক্ত হইয়া আছে। মানসী তাহা জানে, সে মনে করে সেই জন্যই তো মানুষকে উদ্ধারের কাজ করিতে হয়—আর এই কাজেই পরম আনন্দ। মাতার আহ্বানে মানসী প্রস্থান করিল—রাণী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রানা ও রাণীর মধ্যে মানসীর বিবাহের কথা হইল। যোধপুরের রানা বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। রাণী যোধপুর আক্রমণ করিতে বলিলেন। রানা জানাইলেন কাহাকেও আক্রমণের শক্তি তাঁহার নাই; বরং নিজেই আক্রান্ত হইবেন বলিয়া অনুমান করিলেন।

রানা ও রাণী প্রস্থান করিলেন: মানসী প্রবেশ করিল। তাহার স্বগতোক্তি অজয়ের প্রতি তাহার প্রেম প্রায় উন্মুক্ত করিয়া দিল।

এই দৃশ্যটি মহাবৎ-এর আক্রমণের পূর্ববর্তী নাটকীয় বিরাম হিসাবে সৃষ্ট। কেবল একটানা টানাপোড়েনে পাঠক-দর্শকের প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, হাল্কা দৃশ্য কল্পনা করিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে বিশ্রাম দিতে হয়। দুই একটি কথায় ত্রুটি লক্ষিত হয়, মানসী জানাইয়াছিল 'ঠাণ্ডা পড়ছে।' একটু পরেই বলিল, "যখন দারুণ শীতে •জর্জর হই, অমনি নববসন্ত এসে তার সুগন্ধ মন্দ-মারুতে শীতের কুজ্ঝটিকা বন্ধন খুলে দেয়।" হোরির আনন্দ-উৎসব বসন্তের আগমন সংবাদ দিয়াছে তাহা হইলে 'ঠাণ্ডা পড়ছে' হইতে পারে না। বাংলা এবং রাজপুতানার আবহাওয়ার মিশ্রণ ঘটায় নাট্যকারের এই ভ্রান্তি হইয়াছে মনে হয়।

পিতার প্রশ্নের উত্তরে মানসী বলিয়াছিল, "আমি সংসারকে অত খারাপ ভাবতে পারি না, বাবা"। মানসী প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত, সুতরাং সংসার তাহার নিকট কিছুমাত্র খারাপ নহে—'অত খারাপ' কথাটি সুপ্রযুক্ত হয় নাই।

অপূর্ব কবিত্বময় ইঙ্গিতও এই দৃশ্যে আছে। অতীতের কাহিনীতে বর্তমানের স্পর্শ দেওয়াও হইয়াছে। রানা বলিলেন, "আমি যখন অন্নের একটী গ্রাস মুখে তুলে নিচ্ছি, তখন বিশ্ব-জগৎ সেই গ্রাসটির পানে লুব্ধ নয়নে চেয়ে আছে। যেন আমি সেই গ্রাসটি থেকে তাদের বঞ্চিত কর্চ্ছি।" নাট্যরচনা কালে যে সমাজতন্ত্রবাদের কথাটি উঠিতেছিল তাহা স্মরণ করিয়াই হয়তো এইটি লিখিত। রানার মুখে আর একটি কথা নাট্যকার দিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই যুগের এবং হয়তো বা পরবর্তী যুগের মায়েদেরও শুনাইয়া কথাটি বলা হইয়াছে; "আমি চিরকাল দেখে আসছি, যে মা-গুলি চিরকাল জন্মায় সত্যযুগে, আর তাদের মেয়েগুলো জন্মায়—সব কলিযুগে।"

কয়েকটি কথায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করা হইয়াছে: মানসীর আহ্বান, বাবা ঘরে এসো—অন্ধকার হয়ে এলো!" রানার স্বগতোক্তি, "আকাশ কি কালো!"—মেবারের ভবিষ্যতের আভাস দিতেছে।

রানা ও রাণীর প্রস্থানের পর মানসী প্রবেশ করিয়া আপন মনে বলিয়াছিল, "অজয়! অজয়!—না। নিষ্ঠুর তুমি! না। তোমার জন্য আমি শোক কর্বো না—চন্দ্রের জ্যোতি এত ক্ষীণ কেন? উদয়সাগরের বারিবক্ষ হঠাৎ এত ম্লান যে? প্রকৃতির মুখে সে হাসিটি কোথায় গেল?"

—মানসীর প্রেমের উপর ভবিষ্যৎ বিষাদের ছায়াচ্ছন্ন ভাবের ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। নাট্যকার যে বড় কবিও তাহার পরিচয় আছে নানা স্থানে।

২য় দৃশ্য :

মেবারের প্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির—কাল, প্রভাত।

মহাবৎ সাহাজাদা পরভেজকে চিতোর দুর্গ অবরোধ করিতে প্রেরণ করিলেন এবং গজসিংহকে প্রেরণ করিলেন মেবারের গ্রামগুলি অগ্নিদগ্ধ করিতে। গজসিংহকে অবশ্য সাবধান করিয়া দিলেন, "নারীজাতির প্রতি কোন অত্যাচার না হয়।" মহাবতের কণ্ঠে হিন্দুর প্রতি ব্যঙ্গও ধ্বনিত হইয়াছে —"স্বজাতির উপর পীড়ন করে' হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়!"

এই দৃশ্যে মহাবৎ হিন্দু সম্বন্ধে যাহাই বলুন নিজের নিষ্ঠুরতারও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। নারীর উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করার কারণ তাঁহার নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নাও হইতে পারে: কল্যাণী কোন পল্লীর ভগ্ন কুটিরে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার উপর অত্যাচার হইলে মহাবৎ-এরই অপমান। এই কারণেও গজসিংহকে তিনি সাবধান করিয়া থাকিতে পারেন।

মহাবৎ আপন মনেই বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "এ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়,—এ সংঘাত ধর্মে ধর্মে।" কিন্তু ধর্মে ধর্মে সংঘর্ষ হয় না—সংঘর্ষের বীজ নিহিত আছে মানুষের দম্ভের মধ্যে। সৈন্য সংখ্যার জোরে জয়লাভ করিলেই ধর্মের জয় হয় না।

৩য় দৃশ্য :

উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর কক্ষ--কাল, রাত্রি।

রানা অমরসিংহ ও সত্যবতীর সংলাপ। লক্ষ সৈন্য লইয়া মহাবৎ মেবার আক্রমণ করিয়াছে সত্যবতী এই সংবাদ আনিয়াছে। রানার আর মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য অবশিষ্ট আছে। যুদ্ধের প্রথম দিন হইতেই রানা এইরূপ ধ্বংসের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিতেছিলেন—এইবার তাহাই ঘটিবে। রানা সত্যবতীকে বলিলেন, "বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ কর্বে তার নিজের

সন্তান।" সত্যবতীর প্রস্থানের পর রানা আপন মনেই বলিলেন, "যখন জাতি নির্জীব হ'য়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।

গোবিন্দসিংহ রানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন—তিনি সংবাদ দিলেন, "মহাবৎ খাঁ নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে।" অমরসিংহ কোন উপায় দেখিলেন না, কেবল আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া মরিবার আয়োজন করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

রাণীকে রানা মেবারের বিবাহের উৎসব-সজ্জা করিতে বলিলেন। মানসীর কথায় জানা গেল রানা ক্ষিপ্তের ন্যায় কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন।

এই দৃশ্যে অমরসিংহের দেশপ্রেমের চরম পরিচয় পাওয়া যায়। মেবারের মানুষগুলির সুখ-শান্তি নষ্ট হইবে মনে করিয়াই রানা প্রথমে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; পরে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু দেশের শান্তিও নষ্ট হইল, স্বাধীনতাও যাইতে বসিয়াছে। মেবার তাঁহার নিকট কিছুটা ভূমি মাত্র নয়, কখনও মাতা কখনও কন্যার স্বরূপ।

এই দৃশ্যটি অমরসিংহের মনের হতাশা এবং ব্যথা বেদনার পরিচয় বহন করে। কিন্তু সেই সঙ্গে পাঠক-দর্শক চিত্তে একটা সংশয়ও জাগায়। তবে কি অমরসিংহ যুদ্ধ না করিলেই ভাল করিতেন? পরাধীনতাই যদি পরিণতি তবে প্রথমেই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বজায় রাখাই কি উচিত ছিল? নাট্যকার এই সংশয় জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা আছে বুঝিয়াই জানাইয়াছেন যে বিভীষণের দলই চিরকাল সর্বনাশ সাধন করিয়াছে এবং জাতির নির্জীবতাই বিভীষণদের জন্ম দেয়। সুতরাং অমরসিংহের যুদ্ধ জাতিকে সজীব করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে—জাতির সজীবতাই বিভীষণদের মৃত্যু-বীজ বপন করে। অমরসিংহের দেশপ্রেমের উদাহরণ চিরকাল প্রেরণা দান করিবে। সুতরাং পরিণতি যাহাই হউক এই যুদ্ধ সার্থক হইয়াছে।

৪র্থ দৃশ্য :

মেবারের একটি গ্রামস্থ পথ—কাল, সায়াহ্ন।

অরুণ ও সত্যবতী চলিয়াছে গ্রামবাসীদের দেশরক্ষার যুদ্ধে আহ্বান করিতে। নিকটস্থ গ্রামে সেই দিনের জন্য আশ্রয় লইতে তাহারা চলিয়া গেল।

কয়েকজন পল্লীবাসীর প্রবেশ। স্বয়ং মহাবৎ আসিয়াছেন সুতরাং এইবার দেশের সর্বনাশ হইবে বলিয়া তাহারা মনে করে। নিকটস্থ গ্রামে মহাবতের সৈন্যরা আগুন দিয়াছে—সেই গ্রামবাসীদের চীৎকার শোনা যাইতেছে।

অজয় এবং কল্যাণী প্রবেশ করিয়া অগ্নিদগ্ধ গ্রামের অধিবাসীদের রক্ষার নিমিত্ত আলোচনারত গ্রামবাসীদের আহ্বান জানাইল—কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহারা পলায়ন করিল। অজয় মুক্ত তরবারী হস্তে মোগল সৈন্যদের বাধা দিল, অনেক সৈন্য বধ করিয়া সে মৃত্যু বরণ করিল।

কল্যাণী মোগল সৈন্যদের নিকট শুনিল যে পল্লীতে অগ্নিকাণ্ড করিতে স্বয়ং সেনাপতি মহাবৎ আদেশ দিয়াছেন। কল্যাণী মোগল সৈন্যদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় মহাবৎ-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

এই দৃশ্যে মেবারের পল্লীর চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে—সেক্সপীয়রের জনতা চরিত্রের অজ্ঞতা-দুর্বলতার ছাপ এই দৃশ্যে পড়িয়াছে মনে হয়। মেবারের জনতাকে অন্যান্য নাটকের জনতার ভিত্তিতে অঙ্কিত করিতে গিয়া নাট্যকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজপুতানার চাষীরাই রানাদের সৈন্য সমস্যা সমাধান করিত, তাহারা কোন কালেই ভীরু ছিল না—চারণদের সংগীত চিরকাল তাহাদের প্রেরণা দিয়াছে। অমরসিংহের সুখ-সমৃদ্ধির কালে হয়তো রাজপুতদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আসিয়া থাকিতে পারে কিন্তু অমরসিংহের সময়ও তো পর পর কয়েকটি যুদ্ধে মেবার জয়লাভ করিয়াছিল! প্রথম যুদ্ধ হইতে শেষ যুদ্ধের ৬।৭ বৎসরের ব্যবধানও বটে। সুতরাং পল্লীবাসীদের মনে ইহারই মধ্যে পুরাতন গৌরব ফিরিয়া আসা সম্ভব। জনতার চরিত্রে সেক্সপীরীয় ভাব রক্ষা করিতে গিয়া নাট্যকার মেবারের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন।

৫ম দৃশ্য :

উদয়পুরের রাজসভা—কাল, প্রভাত।

সামন্তগণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিলেন : পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া এক লক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চলে না, তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করিতে বলিলেন। রানা সে কথা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "প্রাণ দিতে হবে", গোবিন্দ সিংহ বলিলেন, "আমরা প্রাণ দিব, মান দিব না।"

যুদ্ধের প্রস্তুতি করিতে সকলে প্রস্থান করিলেন। রানার মনে চিতোরের

রূপ ভাসিয়া উঠিল—চিতোরের বিষাদময় রূপ রানার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছে। রানার চক্ষে চিতোর ভাবমূর্তি গ্রহণ করিয়াছে : তাহার সেই ধূলিধূসরিতা, আলুলায়িতকেশা বিষণ্ণ মাতৃমূর্তির অপূর্ব মহিমা রানার চিত্ত জয় করিল।

৬ষ্ঠ দৃশ্য :

মহাবৎ খাঁর শিবির—কাল, প্রভাত।

গজসিংহ ও মহাবৎ খাঁর সংলাপ। অমরসিংহের বীর্য এবং দেশপ্রেম দেখিয়া মহাবৎ মুগ্ধ, নিজে রাজপুত বলিয়া রাজপুতের বীরত্বে তিনি গৌরবান্বিত—গজসিংহকেও তিনি গর্ব করিতে বলিলেন। গজসিংহের কথাটা ভাল লাগিল না, তিনি প্রস্থান করিলেন। কল্যাণী প্রবেশ করিয়া ভ্রাতৃহত্যার জন্য মোগল সৈন্যদের অভিযুক্ত করিল। মহাবৎ জানাইলেন যে যুদ্ধে নিহত হইলে অভিযোগ চলে না। কল্যাণী প্রশ্ন করিয়া জানিল যে মহাবতের আদেশেই নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর মোগল সৈন্যরা অত্যাচার করিয়াছে। কল্যাণী পূর্বে মোগল সৈন্যের নিকট সে-কথা শুনিয়া বিশ্বাস করে নাই, এখন মহাবতের স্বীকারোক্তিতে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। সে আত্মপরিচয় দিলে মহাবৎ একান্ত আগ্রহে তাহাকে জানাইতে চেষ্টা করিলেন যে তাহারই প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতেই তিনি মেবার আক্রমণ করিয়াছেন এবং নিরীহ গ্রামবাসীদেব গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিয়া তাহাদের হত্যা করিতে বলিয়াছেন। কল্যাণী ব্যথিত চিত্তে স্পষ্ট করিয়াই বলিল যে এমন নিষ্ঠুর স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া সে ভুল করিয়াছে, যাইবার কালে সে মহাবৎকে জানাইয়া গেল, "আমি একদিন গর্ব ক'রে বলেছিলাম, কার সাধ্য আমাদের পৃথক করে? কিন্তু এখন দেখছি, আপনার আর আমার মধ্যে একটা সমুদ্র ব্যবধান। আমাদের মধ্যে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে' রয়েছে, আর তার চেয়েও বেশী—আমাদের দু'জনার মধ্যে আমাদের স্বদেশের রক্তের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। সে আর একটি তাৎপর্য পূর্ণ কথা মহাবৎকে শুনাইয়াছিল, "আপনার মধ্যে গর্বী মহাবৎখাঁ যেটুকু, তাই আপনার প্রতিহিংসায় চালিত করেছিল"। মহাবৎ এই কথায় চমকিত হইয়াছিলেন কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য।

মেবার যুদ্ধে মোগলের বার বার পরাজয়ে মহাবতের শৌর্য প্রদর্শনের

আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে—মেবার জয় করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির লোভ তাঁহার হয় নাই মনে হয় না। ৩য় অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্যে সগরসিংহের নিকট কল্যাণীর বিপদের সংবাদ পাইবার পূর্বেই গজসিংহের প্ররোচনা শুনিয়া তিনি অর্ধস্বগত বলিয়াছিলেন, "যদি মেবার আমার জন্মভূমি না হ'ত।" এই উক্তির মধ্যে মহাবতের মেবার জয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষার পরিচয় আছে। কল্যাণীর বিপদের কথা অবলম্বন করিয়াই সেই আশঙ্কা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু নিজে ধর্মত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাবৎ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে কল্যাণী তাঁহার প্রেম ভিক্ষা করিলেও সে মূলতঃ রাজপুতানী। মহাবতের জীবনের ট্র্যাজেডি এই দৃশ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাবৎ হয়তো মনে করিয়াছিলেন যে মেবার ধ্বংস করিয়াই কল্যাণীকে পাওয়া যাইবে, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে ধ্বংসের পথে প্রেমময়ী নারীকে পাওয়া যায় না।

৪র্থ অঙ্কে নাটক সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই অঙ্কে নাট্যকার দেশপ্রেমের পবিপূর্ণ মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন। পতিভক্তির আদর্শ স্বরূপ কল্যাণীর নিকটও পতি অপেক্ষা দেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও মহাবৎ অমরসিংহের বীর্য এবং সাহসে মুগ্ধ, অজয় দেশের মানুষের জন্য আত্মবিসর্জন দিল—অমরসিংহের চেতনায় দেশ একেবারে মাতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সর্বোপবি বিশ্বপ্রেমের প্রতিরূপ মানসী পর্যন্ত বলিয়াছে "এই মহাবৎখাঁ রাজপুত। এই মহারাজ গজসিংহ রাজপুত। এত ঈর্ষা! এত দ্বেষ! হারে অধম জাত! তোমার পতন হবে না ত কার হবে। যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ—আর কে রক্ষা করে।"

এই অঙ্কে রানা পরাজিত হইয়াও গৌবব অর্জন করিয়াছেন—মহাবৎ জয়লাভ করিয়াও কঠিন আঘাত পাইয়াছেন।

পঞ্চম অঙ্ক :

১ম দৃশ্য :

উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর—কাল রাত্রি।

পরাজিত রানা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি যুদ্ধে হত হইলেন না কেন? অন্যান্য সকলের সহিত রণশয্যায় শয়ন করিতে পারেন নাই ইহাই তাঁহার দুঃখ। মহাবতের কামানের যুদ্ধে মুহূর্তে রানা পরাজয় স্বীকার

করিয়াছেন। মানসী রানাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল—রাণী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধভাবেই কথা বলিলেন।

এই দৃশ্যের সংলাপ অত্যন্ত দুর্বল। মানসীর কথাগুলি কোন কোন স্থানে নিতান্ত ছেলেমানুষের ন্যায়, অনেক সময়েই প্রাণহীন—কোথাও বা ঔচিত্যের বিচারে অসংগত। রাণীর কথা এই গম্ভীর পরিবেশের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। রানার কথা অত্যন্ত কাব্যধর্মী হওয়ায় অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নাই। তথাপি রানার কথায় এবং আচরণে তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটি বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে।

মহাবৎ উদয়পুর দুর্গ অধিকার করিতে আসেন নাই, তিনি লজ্জিত, হয়তো কিছুটা অনুতপ্তও।

যুদ্ধে রানার পরাভবের কথা ৪র্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যেই নাট্যকার জানাইয়া ছিলেন।

২য় দৃশ্য :

মেবারের রাজ-অন্তঃপুরের একটি কক্ষের বাহিরে যাতায়াত পথ—কাল, রাত্রি।

পরিচারিকাদের মুখে জানা গেল যে সত্যবতী অজয়ের মৃতদেহ গোবিন্দ-সিংহের গৃহে বহিয়া আনিয়াছে। গোবিন্দ গৃহে ছিলেন না, অরুণ তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে।

মানসীকে আসিতে দেখিয়া পরিচারিকারা প্রস্থান করিল। উদ্‌ভ্রান্ত মানসীর স্বগতোক্তিতে অজয়ের প্রতি তাহার প্রেম সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইল।

এই দৃশ্য যে মেবারের পরাজয়ের পরের ঘটনা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। উদ্‌ভ্রান্ত মানসীর কথায় অতিনাটকীয়তা দেখা যায়। অজয়ের প্রতি তাহার প্রেম স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও গভীর দুঃখের মধ্যে কাহারও পক্ষে এত কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ সম্ভব নয়। পূর্বে তাহার প্রেমের আভাস দেখা গেলেও সে প্রেম যে এত গভীর তাহাও মনে করা যায় নাই। মানসীর গোপন করার শক্তি মানিয়া লওয়া গেলেও এত দীর্ঘ শোকোচ্ছ্বাস স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না; ইহাতে সংগতি রক্ষা করা হয় নাই। এই চিত্রের অসংগতি পাঠকদের দৃষ্টি যদি বা এড়াইয়া যায় দর্শকদের চক্ষে ধরা পড়িবেই। মঞ্চের উপর শোকগ্রস্ত নারীর থামিয়া থামিয়া বিনাইয়া কথা বলা দর্শকদের

সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। মানসীর কণ্ঠে সামান্য কয়েকটা কথা দিয়াই দৃশ্য শেষ করা উচিত ছিল।

৩য় দৃশ্য :

গোবিন্দসিংহের গৃহাঙ্গন—কাল, রাত্রি।

গোবিন্দসিংহ অনুতাপ করিতেছেন—সত্যবতী তাহাকে সান্ত্বনা দিল, আর্তরক্ষায় অজয় প্রাণ দিয়াছে। কিন্তু গোবিন্দ বুঝিয়াও বুঝিলেন না, অজয়ের মৃতদেহ জীবিত বলিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিলেন, একান্ত ক্ষোভে বলিলেন, "মেবার! রাক্ষস! এত নিয়েও তোর উদর পূর্ণ হ'ল না—তুই ত খেতে বসেছিস! তবে সব না খেয়ে যাবি নে। আমার সোনার সংসার।" এই সময় কল্যাণী প্রবেশ করিয়া অজয়ের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিল। গোবিন্দ-সিংহ তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিলে কল্যাণী নিজেকে অকল্যাণের মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়া পিতাকে বলিল, "আমায় বধ কর! বধ কর!"

সত্যবতীর চেষ্টায় গোবিন্দসিংহ শান্ত হইয়া কল্যাণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিলেন।

এমন সময় আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা মানসী প্রবেশ করিয়া সকলের সমক্ষেই অজয়কে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিল—"এই অজয়সিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কেউ জান্তে পারে নি—আমি নিজে জান্তে পারিনি। নীরবে, নিভৃতে, আত্মায়-আত্মায় সে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল।"

বীর গোবিন্দসিংহ অনেক চেষ্টা করিয়াও আত্মসংবরণ করিতে পারিতে-ছিলেন না—উচ্চ আদর্শ সত্ত্বেও মানসীও নিজের উচ্ছ্বাস দমন করিতে সমর্থ হয় নাই। বিমূঢ় কল্যাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সমস্ত দৃশ্যটিই অতি নাটকীয় এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে ফেনায়িত। দৃশ্যটি কেবল যে অসংগত, অস্বাভাবিক হইয়াছে তাহাই নহে—দৃশ্যটি গোবিন্দসিংহ এবং মানসীর চরিত্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। চন্দাবৎ সর্দারদের চরিত্রের পরিচয় নাট্যকার জানিতেন না তাহা নহে, অথচ করুণ স্পর্শ দিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। দেশ রক্ষার যুদ্ধে হাজার হাজার রাজপুত মৃত্যু বরণ করিয়াছে, ইহা দুঃখের হইলেও গর্বের কারণ। যেখানে হাজার হাজার যুবক স্বচ্ছন্দে মৃত্যু-বরণ করে সেখানে সেনাপতি পুত্রের মৃত্যুতে এইরূপ শোকোন্মত্ত হয় না।

শোকে আত্মবিস্মৃতি ঘটাইয়া নাট্যকার চন্দাবৎ গোবিন্দসিংহের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। এই শোক-চিত্র গোবিন্দসিংহের বীর্যবত্তাকে জীবনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া সংশয় জাগাইয়া তুলিয়াছে। মানসীর মহান আদর্শও ইহাতে ক্ষুন্ন হইয়াছে—যাহার হৃদয় বিশ্বমানবের প্রতি প্রেমে অভিসিক্ত সে ব্যক্তিগত দুঃখে এমন করিয়া অভিভূত হইবে কেন? ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের নিকষে পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহার বিশ্বপ্রেমে অনেকটাই খাদ মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়। এই দুইটি চরিত্রের মহত্ত্ব বজায় রাখিবার জন্য দৃশ্যটি অন্যরূপে সজ্জিত করা উচিত ছিল।

৪র্থ দৃশ্য :

মেবারের পর্বত প্রান্তে মহবৎ খাঁর শিবির—কাল সায়াহ্ন।

মহাবৎ আজিও উদয়পুরের দুর্গ অধিকার করেন নাই কেন গজসিংহের নিকট তাহা বোধগম্য নয়। এবার নাকি মেবারের নারীগণ অস্ত্রধারণ করিবে—গজসিংহ সেই যুদ্ধে যাইতে চাহেন। রাজপুত হইয়া রাজপুত নারীদের লইয়া ব্যঙ্গ করায় মহাবৎ গজসিংহকে ধিক্কার দিলেন। গজসিংহ প্রস্থান করিবার পর একজন সৈনিক আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল যে সাহাজাদা সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহাবৎ এই সংবাদের অপেক্ষায় ছিলেন। উদয়পুরের দুর্গে তিনি নিজে প্রবেশ করিতে পারিবেন না—এই কার্য সাহাজাদাই করিবেন। মহাবতের চিন্তার অবকাশে গোবিন্দসিংহ প্রবেশ করিলেন। তিনি মহাবৎকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন—গোবিন্দসিংহ বাঁচিয়া থাকিতে কাহাকেও উদয়পুরের দুর্গ অধিকার করিতে দিবেন না। বৃদ্ধের বীর্যপূর্ণ কথা শুনিয়া মহাবৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন—কিন্তু সালুম্ব্রাধিপতি তাঁহাকে অস্ত্রত্যাগ করিতে দিবেন না। এমন সময় গজসিংহ আসিয়া গোবিন্দসিংহকে গুলি করিলেন। গোবিন্দ আক্রমণকারী মোগলকে ধিক্কার দিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন।

এই দৃশ্যটি বড় চমৎকাররূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। অল্প কথায় মহাবৎ খাঁর বিরক্তভাব, তাঁহার অধৈর্য প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সঙ্গে তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে মেবারের প্রতি শ্রদ্ধা। যুদ্ধ জয়ের পর উদয়পুর দুর্গে প্রবেশের জন্য তিনিই সাহাজাদাকে আনাইয়াছেন।

বাস্তবতার বিচারে মহাবৎ-এর সম্মুখে গোবিন্দের উপস্থিতি হয়তো

অসম্ভব মনে হইতে পারে—প্রহরীদের এড়াইয়া কাহারও মোগল সেনাপতির নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কাব্য সত্যের বিচারে ইহা একান্তই সম্ভব। মহাবতের হস্তে মৃত্যু বরণের জন্য গোবিন্দের ইচ্ছার মধ্যে রাজপুত মহিমার শেষ পরিচয় দেওয়া হইল—গোবিন্দসিংহের মৃত্যুতে মহাবতের জীবনের ট্র্যাজেডি বৃদ্ধি পাইল।

৫ম দৃশ্য :

উদয়পুরের দুর্গের সম্মুখস্থ রাজপথ—কাল, রাত্রি।

পুরবাসীগণ এবং দুর্গরক্ষক রাজপুত সৈনিকের সংলাপের ভিতর দিয়া জানা গেল যে মেবার জয়ের পর মহাবৎ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া সম্রাটকে পত্র লিখিয়াছিলেন—ইহারই ফলস্বরূপ সাহাজাদা খুরম (ভবিষ্যৎ সাহাজান) স্বয়ং আসিয়া রানার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করিয়াছেন। রানা তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার শিবিরে গিয়াছেন।

ইহাদের কথোপকথনের মধ্যে কয়েকজন সৈনিকসহ গজসিংহ আসিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে চাহিলেন : দুর্গরক্ষক সৈনিক এবং পুরবাসীদের সহিত গজসিংহের সৈনিকদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এমন সময় একদল মোগল সৈন্যসহ রানা দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ থামাইলেন। গজসিংহ দুর্গ-প্রবেশের অধিকার চাহিলে রানা তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "মোগলের কুক্কুর! তোমার যোগ্য অতিথি সৎকার এই।"

খুরমের রানার বন্ধুত্ব ভিক্ষা এবং খুরমের সহিত তাঁহার শিবিরে গিয়া রানার সাক্ষাৎকারের ঘটনা টডের গ্রন্থ হইতে গৃহীত—জাহাঙ্গীরের দিন-লিপিতে ইহা আছে।

গজসিংহকে পদাঘাত করিবার ইচ্ছা হইতেই নাট্যকার এই দৃশ্যটি সন্নিবেশের প্রেরণা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গজসিংহকে কিছু শাস্তি না দিলে যেন কাব্যের ন্যায়বিচার হইতেছিল না।

৬ষ্ঠ দৃশ্য :

মেবারের গিরিপথ—কাল, মধ্যাহ্ন।

সত্যবতী অরুণ এবং চারণীগণের শোকগীতি শুনিয়া তিনজন সৈন্যসহ হেদায়েৎ তাহাদের বাধা দিল—এই সংগীত নিষিদ্ধ। সত্যবতী মায়ের

জন্য শোকগীতি গাহিবার দাবী জানাইল, অরুণ দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিল যে সংগীত তাহারা থামাইবে না। হেদায়েৎ বন্দী করার ভয় প্রদর্শন করিল।

সত্যবতী পুনরায় সংগীত আরম্ভ করিবার নির্দেশ দিতেই হেদায়েৎ তাহাকে বন্দী করিতে গেল—অরুণ তরবারি বাহির করিয়া মাতাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হওয়ায় মোগল সৈন্যদের সহিত তাহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অরুণের অস্ত্রাঘাতে একজন সৈন্য ভূপতিত হইলে হেদায়েৎ এবং অন্য দুইটি সৈন্য তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। অরুণের মৃত্যু নিশ্চিত এমন সময় মহাবৎ খাঁ আসিয়া যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন।

মহাবৎ দিদি সত্যবতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল—সত্যবতী অটল। মহাবৎ বাল্যস্মৃতি জাগ্রত করায় সত্যবতী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মহাবৎকে ক্ষমা করিয়া গমনোদ্যত হইলে হেদায়েৎ পুনরায় বলিল, "কোথা যাবে? আমরা তোমায় বন্দী কর্বো।" কিন্তু বন্দী করা হইল না—স্বয়ং সাহাজাদা খুরম আসিয়া সত্যবতীকে সংগীতের স্বাধীনতা দান করিলেন, এমন কি নিজেও সত্যবতী ও চারণীদের সংগীতের সহিত সুর মিলাইয়া হেদায়েৎ এবং সৈনিকদের সংগীতে যোগ দিতে নির্দেশ দিলেন।

টডের গ্রন্থে সাজাহানের মহত্ত্বের কথা আছে, কিন্তু সত্যবতী এবং চারণীদের সহিত সংগীতে যোগদান সম্পূর্ণ কল্পিত। এই কল্পনাও টডের গ্রন্থ অবলম্বনেই করা হইয়াছে এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। প্রতাপের গৌরবের কথা উল্লেখকালে টড বলিয়াছেন যে, যে জাতীয় সংগীত রাজপুতদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিত সেই ভাবাবেগপূর্ণ গান গাহিয়া হিন্দু এবং মোগল রাজপুত্র এবং পদস্থ ব্যক্তিরা দেশপ্রেমিক প্রতাপের প্রশংসায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। টডের এই বক্তব্যকে প্রসারিত করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহানের সংগীতে যোগদান কল্পনা করিয়াছেন।

নাট্যকার কাব্যের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন মনে হয়। মহাবতের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে, গজসিংহও পদাঘাত লাভ করিয়াছেন—হেদায়েৎ আলি মানসীর সম্বন্ধে অশোভন ইঙ্গিত করিয়া অপরাধী হইয়াছে, তাহারও সামান্য আঘাত পাইবার কথা: নাট্যকার এই দৃশ্যে সেই ব্যবস্থাটি করিয়াছেন—হেদায়েৎ কেবল যে অপমানিত

হইয়াছে তাহাই নয়, যে সংগীত সে বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল তাহাতেই যোগ দিতে সে বাধ্য হইয়াছে।

এই দৃশ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন দেখিয়া পুনরায় মনে প্রশ্ন জাগে যে অমরসিংহের যুদ্ধ করা কি ভাল হইয়াছিল? চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকার বীর্যের পরিচয় দিয়া জাতিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই দৃশ্যে আসিয়া হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে। কেবল যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াই কি দেশবাসীকে সজীব করিয়া তোলা সম্ভব? হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগীতে যে সৌন্দর্য স্বষ্টি হইল তাহা কি অধিকতর প্রেরণা দায়ক নয়? নাট্যকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া লওয়া দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

৭ম দৃশ্য :

উদয়সাগরের তীর—কাল, সন্ধ্যা

মানসী সংযত হইয়াছে—তাহার প্রেম আজ আরও দূরে প্রসারিত। কল্যাণী সান্ত্বনা লাভের আশায় তাহার নিকট আসিল, মহবৎকে মুখে সে ঘৃণা জানাইয়া আসিলেও অন্তর তাহার সেই স্বামীপ্রেমেই ভরপুর। মানসী কল্যাণীকে নিজ কার্যের সাহায্যকারী হইতে বলিল—'মনুষ্যের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ' করিয়াই প্রকৃত সুখ লাভ হয়।

সত্যবতী প্রবেশ করিল, জানাইল যে মোগলের সঙ্গে অমরসিংহের সন্ধি হয় নাই—"সাহাজাদা খুরম যে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করে' পত্র লিখেছিলেন, সে মৌখিক প্রার্থনা।" প্রকৃত পক্ষে, "সাহাজাদা চান যে, রাণা দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্মান নেন।"

রানা পুত্রের উপর সিংহাসনের ভার দিয়া বনবাসী হইবেন স্থির করিয়াছেন। মানসী বলিল, "আমি চাই যে, আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক।" তাহার বিশ্বাস চক্ষু বন্ধ করিয়া আচারের হাত ধরিয়া চলিবার ফলেই হিন্দু তাহার চলমানতা হারাইয়া পতনের ব্যবস্থা পূর্ণ করিয়াছে। সত্যবতীকে মানসী স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে।"

নাট্যকারের অত্যধিক ভাবাবেগ এবং বিশেষ উদ্দেশ্য এই দৃশ্যে স্পষ্ট হইয়া

উঠিয়াছে: মানসীর কথাগুলি যেন তাহার নিজের নয়, যন্ত্রের মত সে যেন সেইগুলি উচ্চারিত করিয়া চলিয়াছে। সেই জন্যই চরিত্রটি কোথাও সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই।

রানার সহিত সাজাহানের বন্ধুত্ব ভিক্ষা যদি মৌখিক প্রার্থনা মাত্র হয় তবে পূর্ব-দৃশ্যে সত্যবতী এবং চারণীদের সংগীতে সাজাহানের যোগদানের সার্থকতা কি ছিল! দৃশ্য-সংস্থানে ভাবাবেগ এবং উদ্দেশ্যই প্রাধান্য পাইয়াছে, নাট্যকারের চিন্তাশীলতার পরিচয় নাই।

বাংলা দেশের সামসাময়িক কালে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে কালে মুসলমান আক্রমণকারী সে কালে শোণিতের স্রোত প্রবাহিত না করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করা যায় কি করিয়া! আর তাহাই যদি যায় তবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানকে সংগঠিত করিবার কারণ কি? ইংরাজকেও তাহার অত্যাচার সত্ত্বেও আলিঙ্গন দিবার চেষ্টা করিলেই তো হইত। কালের পার্থক্যের কথা নাট্যকারের স্মরণ ছিল না।

রাজ্য ত্যাগ করিয়া রানা পুত্রকে (করণসিংহ) সিংহাসন দান করিয়া রাজধানীর বাহিরে 'নউ চৌকি'র নির্জন প্রাসাদে বসবাস করিতে থাকেন—উদয়সিংহ এই প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন—ইহা একটি হ্রদের তীরে উদ্যান এবং কুঞ্জবনের মধ্যে অবস্থিত। টডের এই কহিনীকেই সামান্য পরিবর্তন করিয়া নাট্যকার অমরসিংহের বনবাসের ব্যবস্থা করেন। রাজপুতানায় বনবাস না দিয়া টডের গ্রন্থ যথাযথ রূপে অনুসরণ করাই ভাল ছিল। স্মরণ রাখা উচিত যে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ অনেকদিন অতীত হইয়াছে, সুতরাং বনবাসের দিনও গিয়াছে। সত্যকার ইতিহাস অবশ্য অমরসিংহের রাজ্যত্যাগের কথা বলে না।

৮ম দৃশ্য:

উদয়সাগরের তীর—কাল, মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা।

রানা চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় মহাবৎ প্রবেশ করিলেন—রানা তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রতাপের দেওয়া তরবারি মহাবতের দিকে আগাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "এই তরবারি রানা প্রতাপসিংহ মরবার সময়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'দেখো যেন তার অপমান না হয়।' আমি তার অপমান করেছি। সে অপমান আমার রক্তে ধৌত হ'য়ে যাক।"

রানার বিশ্বাস মহাবৎ তাঁহাকে বধ করিতে পারিলে সুখীই হইবেন। কিন্তু মহাবৎ জানাইলেন, "রাণা, মহাবৎ খাঁ যোদ্ধা ; সে জল্লাদ নয়।"

এইবার রানা মহাবৎ-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন—মহাবৎকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিলেন, "অস্ত্র নাও—ছাড়বো না। অধম ! নরকের কীট ! শয়তান।" মহাবৎ আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া জানাইলেন, "উত্তম রাণা—তবে তাই হোক। সাবধান রাণা ! মহাবৎ খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে যদি কেউ থাকে ত তুমি—তবু সাবধান—।"

কিন্তু ভ্রাতৃহত্যা হইল না—মানসী আসিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইল ; তাহার বক্তব্য, "এ শোকের সান্ত্বনা হত্যা নহে—এর সান্ত্বনা—আবার মানুষ হওয়া।"

চারণীগণ 'কিসের শোক করিস ভাই—আবার তোরা মানুষ হ' গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। রানা এবং মহাবৎ বিস্মিত হইলেন : পরস্পরের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহারা আলিঙ্গন করিলেন।

যে নাটকের উদ্বোধন হইয়াছিল দেশপ্রেমের গৌরব প্রদর্শন করিয়া, সেই নাটকের সমাপ্তি রচিত হইল বিশ্বপ্রেমের মহিমায়। অমরসিংহ-মহাবৎ, সকলেরই অপরাধের কথা ভুলিয়া নাট্যকার একটা মিলনের চিত্র অঙ্কিত করিলেন। কিন্তু নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রকৃতই কি তাহা লইয়া সংশয় রহিয়া গেল।

বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয় নাই তাহা পূর্বের দৃশ্যেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্যবতীর মুখ দিয়া নাট্যকার সেই দৃশ্যে বলাইয়াছেন, "বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে, হাতে হাতে। পদাঘাতের সঙ্গে পৃষ্ঠের বন্ধুত্ব হয় না, জয়ধ্বনির সঙ্গে আর্তনাদের বন্ধুত্ব হয় না।" কিন্তু নাটকের যবনিকা পাতের মুহূর্তে মিলন ঘটিল অমরসিংহ এবং মহাবৎ খাঁর, দুই রাজপুতের—দুইটি ভ্রাতার। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকার রানার মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন, "যখন জাত নির্জীব হয়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।" রানার এই যুদ্ধ যত ব্যর্থই হউক জাতির প্রাণে গতি সঞ্চার নিশ্চয়ই করিয়াছে—জাতি তাহা হইলে বিভীষণের হাত হইতে উদ্ধার পাইবে ! নাটকের উপসংহারে মহাবতের পরিবর্তনের মধ্যে নাট্যকার কি তাহাই দেখাইলেন ? মানসীর

বিশ্বমৈত্রীর উদ্বোধনের চেষ্টা সার্থক হয় নাই, কেবল জাতির ভিতরের ভেদ দূর করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধ, অজ্ঞতা যতদিন থাকিবে ততদিন জাতির মুক্তি নাই ইহাই নাট্যকারের প্রতিপাদ্য হইলে বিংশ শতাব্দীতেও তাহাকে প্রয়োগ করা যাইত। এই কালে হিন্দু-মুসলমান একই রাজ্যের অধিবাসী সুতরাং ভ্রাতার ন্যায়। তাহাদের মিলন না হইলে ইংরাজের হাত হইতে মুক্তি নাই—উদ্দেশ্য তাহা হইলে সহজবোধ্য হইত। কিন্তু মানসী চরিত্র, নাটকের ঘটনা সংস্থান এই সহজ উদ্দেশ্যের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে না। নাটকের রস তাই কেন্দ্রগত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

উপসংহারে নাট্যকার হতাশার মধ্যেও আশার বাণী শুনাইতে চাহিয়াছেন।

পঞ্চম অঙ্কে গোবিন্দসিংহের বীর্য ও আত্মমর্যাদাবোধ, রানার ব্যক্তিত্ব ও গজসিংহের শাস্তি প্রভৃতি সত্ত্বেও মানসী ও তাহার আদর্শই প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু নাট্যকার সেই আদর্শকে নাটকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন নাই—এই আদর্শই অনেকক্ষেত্রে অসংগতিও সৃষ্টি করিয়াছে। তত্ত্বগতভাবে মানসীর আদর্শকে প্রাধান্য দিবার চেষ্টা সত্ত্বেও দেশপ্রেমই সকলের ঊর্ধ্বে স্থান পাইয়া গিয়াছে। যে মেবারের ঘটনা স্মরণ করিয়া বহুদিন হইতে ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়াছে সেই মেবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ব-মৈত্রীব কথা স্মরণ করান কিছুতেই সম্ভব নয়। বর্তমানে অনেক মানুষই মানসীর ন্যায় মনে করে, "যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক।" কিন্তু পরাধীন মানুষের দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া যে মিলন চেষ্টা তাহা মনুষ্যত্বের বিরোধী। সুতরাং মানসীর বিশ্বপ্রেমের প্রতিষ্ঠা রাজপুত-মোগলের মধ্যে কিছুতেই হইতে পারে না। ইহার জন্য অন্য কোন কাহিনী অবলম্বন করা উচিত ছিল।

নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ —

অমরসিংহ ঃ

অমরসিংহ বিলাসী সৌখীন রানা হইলেও বীর যোদ্ধা ছিলেন। বিলাসের

জড়তা হইতে মুক্তি পাইবার পর তাঁহার হৃদয় উৎসাহ উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা যখন তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন তিনি সন্ধির জন্য উন্মুখ হইয়া ওঠেন; কিন্তু সত্যবতীর নিকট চিতোর দুর্গ লাভের সম্ভাবনার কথা শুনিয়া তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, পিতার স্বপ্ন সফল হইতে চলিয়াছে দেখিয়া তিনি সামন্তদের উৎসাহ ভরে আহ্বান করিয়া বলেন, "দুর্গ অধিকার কর—সেনাদল গঠন কর, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কর।" যিনি যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছুক ছিলেন না, জয়লাভের পরও যিনি সন্ধির পক্ষপাতী ছিলেন তিনিই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন।

কেবল বিলাসই অমরসিংহকে প্রথমে যুদ্ধে প্রণোদিত হইতে বাধা দিয়াছিল একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। সালুম্ব্রা এবং সত্যবতীর মুখেই অমরসিংহের বিলাসের কথা শোনা গিয়াছে; সগরসিংহও অরুণকে একবার সেই কথা স্মরণ করাইয়া অমরের যুদ্ধ জয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অমরসিংহের মুখে সন্ধি করিবার কথা শোনা গিয়াছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে—সেই কারণটি একটি বড় জিজ্ঞাসা মানুষের মনে তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। অমর মনে করেন স্বাধীনতা একটা সুন্দর অনুভূতি মাত্র, ভাবের জগতেই তাহার স্থান—তাহার সত্যকার কোন বাস্তব ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। দেশের মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্যই দেশকে স্বাধীন রাখিতে হয়—পরাধীন জাতির জীবন দুর্বিসহ। রানা মনে করেন যে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধের অর্থই দেশের মানুষের সর্বনাশ সাধন, সন্ধি করিলে নামমাত্র পরাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে—দেশের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই নিজের হাতে থাকিয়া যাইবে। বিশেষ, মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষাও সম্ভব নহে। সুতরাং যেখানে পরাধীনতা অবশ্যম্ভাবী এবং সেই সঙ্গে দেশের মানুষের সর্বনাশ তাহা অপেক্ষা পরাধীনতা স্বীকার করিয়া দেশের মানুষকে রক্ষা করার ইচ্ছাই রানার মধ্যে দেখা দিয়াছিল। একটা অনুভূতির জন্য দেশের সর্বনাশ করিতে রানা চাহেন নাই। অমরসিংহের মনের দ্বন্দ্ব তাঁহার বিলাসিতা হইতে আসে নাই—আসিয়াছে তাঁহার চিন্তাশীলতা হইতে। ঐশী শক্তি সম্পন্ন রানা প্রতাপ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু অমরসিংহ মানুষ। তাই তিনি এত চিন্তিত, এত দ্বিধাগ্রস্ত।

চিন্তাশীল রানা দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন ; মোগলের মনোভাব তাঁহার বেশ ভালো রূপই জানা ছিল। মোগল বার বার পরাজিত হইয়াও ফিরিয়া আসিবে এবং শেষ পর্যন্ত মেবারকে যে ধ্বংস করিবে রানা তাহা নিশ্চিতরূপেই বুঝিয়াছিলেন, "পূর্বেই জান্তাম গোবিন্দসিংহ। এক দেবারে এ যুদ্ধ শেষ হবে না। মোগল সমস্ত রাজপুতানা সমভূমি না করে' ছাড়বে না।" তিনি আরও জানিতেন যে ভারতের আকাশে বিভীষণেরা বার বার জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং জাতিকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। রাজপুতের গৌরবময় ইতিহাসের সহিত তাহার জীবনের কলঙ্কের কথাও তাঁহার অবিদিত ছিল না, "বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ কর্বে তার নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশীলা। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ, আর শাক্তসিংহ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই মহাবৎ খাঁ, আর গজসিংহ। ঠিক মিল্‌ছে না!" এই কথা বলিবার কালে ভাবপ্রবণ অমরসিংহের মুখে-চোখে যে বেদনা-ক্ষোভ-ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা অতি সহজেই পাঠকের কল্পনায় ধরা পড়ে। জাতি যখন দুর্বল হয় তখনই বিভীষণের দল জন্মগ্রহণ করে।

বীরের জীবনের প্রতি অমরসিংহের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাই জয়োৎসব করিবার সময় মৃত বীরের স্মৃতিতে তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। বীরের প্রতি শ্রদ্ধাই বোধ হয় তাঁহার অন্তরে ক্ষুদ্র-মনা লোভী মানুষের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা জাগাইয়া রাখিয়াছে। পরার্থে যে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, ত্যাগের মহিমা যে লক্ষ্য করিয়াছে সে সহজেই তাঁহার অন্তরের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া লয়।

অতিশয় ভাবপ্রবণতা রানাকে দার্শনিক করিয়া তুলিয়াছে : বিষাদময়তা এবং দুঃখবাদ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে সমস্ত জগৎই তাঁহার নিকট মায়া বলিয়া মনে হয়। চিত্তের হতাশা হইতেই এই মায়াবাদী মনোভাবের জন্ম। কিন্তু চিত্তের এই হতাশা, এই দুঃখবাদ সত্ত্বেও তাঁহার ব্যক্তিত্বে এক ভাবগভীর মর্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই মর্যাদায় আঘাত লাগায় ক্ষোভে আত্ম-বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছিল। এই মর্যাদা বোধই তাঁহাকে মহাবৎ খাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিতে প্রণোদিত করে : সেই মর্যাদাবোধই তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্বাসনের পথে ঠেলিয়া দিল।

ইতিহাসের অমরসিংহ হইতে 'মেবার পতন'-এর রানার চরিত্র কিছুটা পৃথক করিতে গিয়া এবং টডের গ্রন্থের ভিত্তিতে নিজ ভাবজগৎকে রূপ দিবার চেষ্টায় দ্বিজেন্দ্রলাল রানার চরিত্রে অসংগতি সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। যিনি বিলাসী তিনিই চিন্তাশীল এবং বীর যোদ্ধা হইয়া উঠিয়াছেন। যিনি প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন তিনিই আবার অন্যত্র মায়াবাদী হইবার উপক্রম করিয়াছেন। প্রজাদের মঙ্গলের কথা স্মরণ করিয়া যিনি প্রথমেই পরাধীনতা স্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন চরম ধ্বংসের পূর্বে দেখা গেল নিজের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া তিনিই সর্দারদের উপদেশ তুচ্ছ করিয়া সমস্ত দেশকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিলেন, "যখন সন্ধি কর্তে চেয়েছিলাম, তোমরা শোন নাই। তখন মোগল সন্ধি কর্তে চেয়েছিল। সে যোগ উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। এখন যেচে মোগলের বন্ধুত্ব নিতে পারি না।" সুতরাং চরিত্রটিতে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দান করিতে যে লেখক সক্ষম হন নাই তাহা সত্য : চরিত্রটি খুব সজীব এবং গতিশীলও হইয়া ওঠে নাই। তাহা হইলেও অমরসিংহকে ঘিরিয়া এক বিষাদময় গম্ভীর মহিমা যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা নিঃসংশয়ে স্বীকার্য।

মহাবৎ খাঁ :

মহাবৎ খাঁ প্রতাপসিংহের ভ্রাতা সগরসিংহের পুত্র। সগরসিংহ মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিলেও ধর্মত্যাগ করেন নাই। মহাবৎ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া মোগলের অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু অমরসিংহ যে তাঁহার ভ্রাতা, মেবার যে তাঁহার জন্মভূমি একথা তিনি তখনও ভুলিতে পারেন নাই। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহের কন্যা কল্যাণী তাঁহার স্ত্রী। সগরসিংহ এবং মহাবৎ মোগল পক্ষে যোগ দিবার পর হইতে আর কল্যাণীর সহিত মহাবতের সাক্ষাৎ হয় নাই। গোবিন্দসিংহ তাঁহাকে ধর্মত্যাগী বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘৃণা করেন; তাহারই প্রতিশোধ-স্বরূপ মহাবৎও কল্যাণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু মহাবতের মন কোমলে কঠোরে সমন্বিত। কল্যাণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও তাই তাঁহার মনে শান্তি নাই : নারীজাতির প্রতিই তিনি শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধা অবশ্য কল্যাণীকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

মহাবৎ গুণী—গুণকেই তিনি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে

কয়েন। বীরত্বের গৌরব তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করেন। মোগল পক্ষে যোগ দিলেও তিনি অন্ধ স্তাবকতাকে ঘৃণা করিতেন, গজসিংহের ন্যায় সুবিধাবাদীদের তিনি বিষের ন্যায় পরিত্যাজ্য বলিয়া এড়াইয়া চলিতে চাহিতেন।

তিনি যে কেবল নিজের জন্মভূমিকে ভোলেন নাই তাহাই নহে, নিজের জাতি-গৌরবও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অমরসিংহের বীরত্বে তিনি মুগ্ধ, নিজেকে সেই রাজপুত বলিয়া তিনি গৌরবান্বিত বোধ করেন, গজসিংহকে তিনি উদ্দীপ্ত ভাবেই বলিয়াছেন, "এই বলে' গৌরব অনুভব কৰ্চ্ছি যে, আমি ধর্ম্মে মুসলমান হ'লেও, আমি জাতিতে এই রাজপুত; এই মনে করে', যে আমি এই অমরসিংহের ভাই।"

মহাবৎ খাঁ বীর বুদ্ধিমান সেনাপতি, যুদ্ধের ভার লইয়া আসিয়া মুহূর্তের জন্যও বিলাস-বিশ্রামের কথা চিন্তা করেন নাই। সেনাপতিরূপে তিনি নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি স্বরূপ। তাঁহার চরিত্রে বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রাজপুতের শৌর্য-বীর্যে তিনি শ্রদ্ধান্বিত, অপর দিকে যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি হিন্দু-রাজপুতের কথা স্মরণ করিয়া সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, "হিন্দু! রাজপুত! মেবার! সাবধান! এ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়,—এ সংঘাত ধর্ম্মে ধর্ম্মে। দেখি কে জেতে।" হিন্দুর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধে তিনি সত্য পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন ধর্মে ধর্মে সংঘাতও ইহা নহে—এক সাম্রাজ্যের শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্র জনপদের সংঘাত—রাজপুতের পরাজয় ধর্মের পরাজয় সূচিত করে না।

প্রথমে জন্মভূমি মেবার আক্রমণে অনিচ্ছা থাকিলেও নিজের বীর্য ও শক্তির পরিচয় দানের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বরাবরই ছিল। বার বার মেবারে মোগল সেনাপতিদের পরাজয় দেখিয়া মেবার জয়ের আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে তাঁহার নিজেরই অর্ধস্বগত উক্তিতে, "যদি মেবার আমার জন্মভূমি না হ'ত!" তাহা সত্ত্বেও যুদ্ধ জয় করিয়াও যে তিনি মেবার দুর্গে প্রবেশ করেন নাই তাহার কৃতিত্ব কল্যাণীর। কল্যাণী মহাবতের অন্তরের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিল, "আপনার মধ্যে গর্বী মহাবৎ খাঁ যেটুকু, তাই আপনার প্রতিহিংসায় চালিত করেছিল।" কল্যাণীর স্পষ্ট উক্তি মহাবৎকে চমকিত করিয়াছিল, সচকিত মহাবৎ নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "সে কি! সত্য না কি!" কল্যাণীর কঠিন বাক্য তাঁহাকে

কিছুটা অনুতপ্ত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। সেই অনুতাপের মনোভাবই তাহাকে অরুণকে রক্ষা করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে সত্যবতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়াছে; কিছুকালের জন্য তাঁহাকে উচ্চ ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছে, "একবার এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাও, যে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, যে তুমি প্রপীড়িত আমি অত্যাচারী। শুদ্ধ মনে কর, যে তুমি মানুষ আমি মানুষ, তুমি ভগ্নী আমি ভাই।" এই অল্পকাল স্থায়ী মহৎ ভাবের প্রেরণাতেই তিনি সালুম্ব্রার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মহাবতের অহমিকা তাঁহাকে অধিকক্ষণ উচ্চলোকে থাকিতে দেয় নাই। বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহের সহিত জয়-লাভে কোন গৌরব নাই ইহা তিনি জানিতেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলে ভীরুতার অপবাদ হইবে না ইহাও তাঁহার অজানা ছিল না। কিন্তু এই মহত্ত্ব তিনি অমরসিংহের বেলায় রক্ষা করিতে পারেন নাই। রানা খ্যাতিমান যোদ্ধা, মহাবতের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী—'মহাবৎ খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে যদি কেউ থাকে ত তুমি—তবু সাবধান—", তাই তাঁহার সহিত যুদ্ধ বিমুখ হইলে ভীতির নিন্দা সহ্য করিতে হইতে পারে। রানার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাবৎ বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন: জল্লাদের ন্যায় নিরস্ত্র রানাকে তিনি বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও রানার নিন্দা বাক্য শুনিয়া তিনি অস্ত্র ধারণ করিলেন। রানার ন্যায় সহজে আত্মবিসর্জন দিবার মহত্ত্ব তাঁহার ছিল না। সালুম্ব্রার ক্ষেত্রে তিনি যেমন সহজে অস্ত্র গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, অমরসিংহের ক্ষেত্রে তিনি যে তাহা পারেন নাই তাহার অন্যতম কারণ ইহাও হইতে পারে যে ভারতে তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্রযোদ্ধার সহিত যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনের গোপন কোণে সঞ্চিত ছিল: নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ গর্বী মহাবৎ হয়তো পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাই। তবে যোদ্ধার মহত্ত্বটুকু তাঁহার ছিল বলিয়াই রানার অন্যমনস্কতা এবং চাঞ্চল্য দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

মহাবতের অন্তরের দুর্বলতাই তাঁহাকে হিন্দুর প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুর কুসংস্কার, তাহার মুসলমান বিদ্বেষ তিনি নিজের ব্যক্তি সত্তার উপর আক্রমণ বলিয়াই মনে করিতেন। হিন্দুর চিন্তাকে তিনি নিজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন। হিন্দুর কুসংস্কারই তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল,

হিন্দুনারী যে হিন্দুধর্মেরই নির্দেশে পতির জন্য সর্বরকম দুঃখ বরণ করিয়া লয় তাহা তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই—"যে ধর্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়; যে ধর্মের চরম বিকাশ সর্বভূতে দয়া—যে দয়া শুদ্ধ মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ নয়, সামান্য পিপীলিকাটি বধ কর্তে যে ধর্ম নিষেধ করে" সেই ধর্মের তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তাই মুসলমান ধর্মের উপর যত বিশ্বাসই তাঁহার থাকুক না কেন, সত্য-জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি সে ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। একস্থানে মহাবৎ বলিয়াছেন, "আমি ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠ করে' এটা ঠিক বুঝেছি, যে স্বজাতির উপর পীড়ন করে' হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়।" অথচ সগরসিংহ অন্যত্র বলিয়াছেন, "ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচার্যের সেই ধর্ম ছাড়বার আগে—সে ধর্মটী পড়ে' দেখেছিলে কি মহাবৎ খাঁ? মূর্খ-অনক্ষর হ'য়ে এত ধর্মাধর্ম বিচার তোমার কবে থেকে হ'ল!" অনক্ষরের পক্ষে পাঠ সম্ভব নয়—লেখকের অনবধানতার জন্য মহাবৎ চরিত্রে কিছু কিছু অসংগতি থাকিয়া গেছে। মানবতার কথা কোথাও কোথাও বলিলেও তিনি যুদ্ধে অত্যন্ত হিংস্রতার পরিচয় দিয়াছেন—মানবেতর না হইলে এইরূপ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন সম্ভব নহে। দম্ভই তাঁহার সদ্‌গুণগুলির সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে দেয় নাই।

কল্যাণী ঃ

কল্যাণী আদর্শ হিন্দু পত্নী। স্বামীই তাহার নিকট ইহলোকের সমস্ত সুখ-আনন্দের উৎস—'যৌবননিকুঞ্জের পিকবর' এবং "সুষুপ্তির-সুখ-জাগরণ'; তিনিই আবার তাহার উপাস্য দেবতা—'চিরজীবনের তপস্যা।' বিধর্মী স্বামীকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করা যায় কি না এ বিষয়ে প্রথমে তাহার মনে বিশেষ সংশয় জাগিয়াছিল, কিন্তু মানসীর নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কল্যাণী বুঝিল যে স্বামীপ্রেমে জাতি-ধর্মের পার্থক্য কোনরূপ বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। তাই সে দৃঢ়কণ্ঠে পিতাকেও জানাইয়া দিয়াছিল, "আমি ধর্ম জানি না, আচার জানি না। এই মহাবৎ খাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল। সেই বিবাহ বন্ধনে ঈশ্বরকে সাক্ষী করে', সেদিন আমরা দুইজন এক হয়েছিলাম। কার সাধ্য সে বন্ধন ছিন্ন করে!" ঈশ্বর যেমন চির জ্যোতির্ময়, স্বামীও সেইরূপ কল্যাণীর চিত্তাকাশে চিরজ্যোতির্ময় রূপে বিরাজ

করিতেছেন: হিন্দুনারীর এই আদর্শ কল্যাণী নিজ জীবনে বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তাই স্বামীর জন্য দুঃখবরণ তাহার নিকট তুচ্ছ। সত্যবতী যেমন মেবারের জন্য 'সৌধ, সম্ভোগ, পিতা, পুত্র' ছাড়িয়া চারণীরূপে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কল্যাণীও সেইরূপ স্বামীর জন্য পিতৃগৃহ-সুখ-শান্তি সমস্তই বিসর্জন দিয়া পথে পথে হাঁটিয়া ফিরিয়াছে, দস্যু কবলে পড়িয়াছে এবং সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়াছে। গোবিন্দসিংহ যখন তাহাকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন তখন স্বামীপ্রেমে উদ্দীপিত কল্যাণী পিতকে জানাইয়াছিল, "আপনি যেমন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি আজ আমার স্বামীর জন্য সেই মহা আনন্দময় উৎসর্গের পথে চলেছি।" স্বামীর জন্য দুঃখ স্বীকার করিতে পারিয়া সে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। তবে ইহাও সত্য যে স্বামীপ্রেম কল্যাণীর অন্তরে এত অধিক আবেগ সঞ্চার করিয়াছিল যে সে সত্য হইতে অনেকসময়েই অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। কোন মানুষকেই সমাজ হইতে, অন্য মানুষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। কল্যাণী কখন কখন তাহা করিতে গিয়াই ভ্রমে পতিত হইয়াছে। তাই সে যখন অত্যন্ত আবেগ-ভরে বলিয়াছিল, "আমি পিতা বুঝি না, জাতি বুঝি না, ধর্ম বুঝি না। আমার ধর্ম পতি।··তাঁর সঙ্গে যদি এর জন্য নরকে যেতে হয়, তাও আমি যেতে প্রস্তুত" তখন যে সে জীবন-সত্য উদ্ঘাটিত করে নাই তাহা নিশ্চিত। সকলের সহিত মিলাইয়া সে স্বামীকে গ্রহণ করিতে চাহে নাই বলিয়াই তাহাকে আঘাত পাইতে হইয়াছিল।

স্বামীর প্রতি গভীর বিশ্বাসের ফলেই সে কিছুতেই প্রথমে মনে করিতে পারে নাই যে মহাবতের আদেশেই মোগল সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে আগুন লাগাইয়া বেড়াইতেছে এবং নির্বিচারে হত্যার তাণ্ডব আরম্ভ করিয়াছে। দৃঢ়চিত্তে তাই সে মহাবতের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বামীর স্বীকারোক্তিতে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া গিয়াছিল। স্বামী প্রেম হইতে জাত অন্তর্দৃষ্টি দিয়া সে 'গর্বী মহাবৎ খাঁ'র রূপটুকুও দেখিয়া লইয়াছিল।

স্বামীপ্রেম কল্যাণীর দেশপ্রেমকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। ইহা সত্য যে গভীর প্রেম থাকিলে ধর্মমতের পার্থক্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু কল্পনায় গড়িয়া তোলা স্বামীর রূপ যদি বাস্তবের সহিত না মেলে, যাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করা

হইয়াছিল তাহাকে যদি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয় তবে আর ভক্তি-শ্রদ্ধাকে দৃঢ়তার সহিত আঁকড়াইয়া থাকা যায় না। কল্যাণীরও প্রায় তাহাই হইয়াছিল। দেশপ্রেমের সহিত স্বামীপ্রেমের সংঘর্ষ তাহার সমস্ত মনোজগতকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই প্রিয়তম স্বামীকেও সে কঠিন আঘাত দিয়াছিল, "আপনি এই দেশের সন্তান, আপনার ধমনীতে বিশুদ্ধ রাজপুত রক্ত, আপনি তুচ্ছ রৌপ্যের লোভে বিদ্বেষে স্বজাতির উচ্ছেদ সাধন কর্তে বসেছেন।" কল্যাণীর তাই মনে হইয়াছিল যে তাহার এবং মহাবতের মধ্যে স্বদেশের রক্তের ঢেউ প্রবাহিত হইয়া চিরবিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ সত্য দর্শন নয়। কল্যাণীর স্বামীপ্রেম স্বজাতিকে তুচ্ছ করিতে পারে নাই, আবার তাহার দেশপ্রেমও স্বামীকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে নাই। মহাবৎকে সে যাহাই বলুক না কেন সর্বসময়েই তাহাকে গভীর ভাবে ভালবাসিত।

জীবনের প্রথমেই কঠিন আঘাত পাওয়ায় কল্যাণী রাজপুত রমণীর ন্যায় হইয়া উঠিতে পারে নাই। রাজপুতের অস্ত্রধারণ অর্থই মুসলমানের সহিত যুদ্ধমান অবস্থা: কল্যাণীর তাহাতে উভয় দিকেই বিপদ। একদিকে পিতা-ভ্রাতা-দেশ অপর দিকে স্বামী। সুতরাং অস্ত্রের ঝনঝনা শুনিলেই সে ভীত হইয়া ওঠে। নাটকের প্রথমেই সেই কারণে তাহার আর্তস্বর শোনা গিয়াছে, "না, ও তরবারি রেখে দাও বাবা। আজ হঠাৎ তোমার হাতে তরবারি কেন? তোমার ও মূর্তি দেখলে আমার ভয় করে।" তাহার একা থাকিতেও ভয় করে, মুসলমান সৈন্যের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়াও সে ভীত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মূলতঃ সে রাজপুত রমণী। তাই ভয় যখন সত্যই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখন গোবিন্দ সিংহের রক্ত তাহার মধ্যে চঞ্চল হইয়া ওঠে। পলায়নপর গ্রামবাসীদের সে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রী অজয় যখন তাহাকে পলায়ন করিতে বলে তখন সে দৃঢ়কণ্ঠে জানায়, "তুমি মরে, আর আমি পালাবো দাদা?"

কল্যাণী জীবনে যাহা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছে তাহাই হারাইয়াছে। স্বামী মুসলমান হইয়া দেশদ্রোহিতা করিয়াছেন; পিতা এবং দেশের কথা মনে করিয়া সে মহাবতের সহিত যাইতে পারে নাই। আবার মহাবতের নিকট যখন সে যাইতে চাহিয়াছে তখন তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে

অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার ভিতরে গভীর স্বামীপ্রেম দেখিয়া পিতা তাহাকে গৃহ-ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। পিতৃগৃহচ্যুত কল্যাণী ভ্রাতাকে আশ্রয়-রূপে পাইয়া পথে বাহির হইল এবং এই পথেই তাহাকে হারাইল। গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হইয়া সে তাই নিজেকে 'গৃহে অকল্যাণের শিখা', 'মেবারের ধূমকেতু' এবং পৃথিবীর সর্বনাশ বলিয়া মনে করিয়াছে।

পিতা গোবিন্দসিংহও মৃত্যু বরণ করিলেন। সকল হারাইয়া কল্যাণী মানসীর নিকট সেবাধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিল। কল্যাণীর দুঃখময় জীবনে মহৎ ভাবনার বীজ রোপণ করিল মানসী। পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া কল্যাণীও জীবনে সার্থকতার সম্ভাবনা দেখিতে পাইল।

সত্যবতী ঃ

সত্যবতী চরিত্রটি সজীব, প্রাণবন্ত এবং তাহার পদক্ষেপও বেশ দৃঢ়। প্রথমেই তাহাকে নাটকে প্রবেশ করিতে দেখি চারণের দলের সহিত—রাজপুত গৌরবের ঐতিহ্যপূর্ণ সংগীত তাহাদের কণ্ঠে। জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি ত্যাগ করিয়া জাতি এবং দেশের সেবা করিতে সে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। মোগলের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই তাহার জীবনের সাধনা। যত বিপদই আসুক না কেন রানা প্রতাপের পুত্র কখনও পিতার দৃঢ়তা বিস্মৃত হইবেন না ইহাই তাহার গভীর বিশ্বাস, "রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র বাস্তবিক মোগলের সঙ্গে সন্ধি কর্বার কল্পনাও কর্তে পারেন! হ'তে পারে না। নিশ্চয় কোন ভ্রম হয়েছে।" কিন্তু যখন সে দেখিল যে রানার সন্ধি প্রচেষ্টা ভ্রম নহে, একান্তই সত্য, তখন সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সমস্ত রীতি ভুলিয়া গিয়া রানাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "সামন্তগণ! রাণা উদয়সাগরের প্রাসাদকুঞ্জে শুয়ে বিলাসের স্বপ্ন দেখুন। আমি তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাব।"

অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত সত্যবতীর বাণী। বীরত্বের গৌরব সে সমস্ত দেহ-মন দিয়া অনুভব করে। বীরের রক্তপাতে যখন সকলে শোকগ্রস্ত তখনও সত্যবতীর চিত্ত-উদ্বোধনী বাণী শ্রুত হয়, "বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে! দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে; দুঃখ সেই দেশের, যে দেশের বীর মরে না।" সত্যবতীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের

পুত্রের মৃত্যু সম্ভাবনা দেখিয়াও সে বিচলিত হয় না : মুহূর্তের দুর্বলতাকে জয় করিয়া সে পুত্রকে বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণে উৎসাহিত করে।

যেখানে দুর্বলতা সেখানেই সত্যবতীর উৎসাহ বাণী শোনা যায়। রানাকে বার বার যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সে, গোবিন্দসিংহের পুত্রের মৃত্যুতে সেই তাহাকে প্রেরণা যোগাইয়াছে—মেবারের শঙ্কিত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের প্রাণে তুলিয়াছে সাড়া। পরাভূত হইবার পরও শোকগাথা গাহিয়া সে বাহির হইয়াছে পথে পথে : জাতিকে কখনও যেন সে নির্জীব হইয়া পড়িতে দিবে না।

সত্যবতীর দেশাত্মবোধ তাহার মাতৃহৃদয়ের কোমলতাকে নিঃশেষ করিতে পারে নাই। দেশপ্রেম নিজের দেশকে ভালবাসিতে শিখায়, দেশের মানুষকে ভালবাসিতে শিখায়—নিজের সন্তান হৃদয়ের আরও নিকটে সরিয়া আসে। সত্যবতীর দেশপ্রেম নিছক তত্ত্বরূপে আসে নাই, ইহা তাহার জীবনে সত্য-রূপে দেখা দিয়াছে—সে দেশপ্রেম সরস, নিজের প্রাণের রসে সঞ্জীবিত। কঠিন কর্তব্যে রত থাকা সত্ত্বেও তাহার অন্তরের নারী সজীব ছিল বলিয়া সে মহাবৎকে ক্ষমা না করিয়া পারে নাই। মহাবৎ তাহার দেশের শত্রু হইলেও স্নেহের ভ্রাতা—অনুতাপের অনলে সে দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া সত্যবতী তাহাকে মার্জনা করিয়াছিল।

পিতার মোগল-দাসত্ব গ্রহণে সে অত্যন্ত লজ্জিত, নিজের জীবনের আচরণের দ্বারা সে পিতার মনও স্পর্শ করিয়াছিল। সগর যে মহৎ জীবনের সন্ধান পাইলেন তাহাতে তাহার হাতও কিছুটা আছে। বিনা যুদ্ধে চিতোর দুর্গ একরকম সে-ই উদ্ধার করিয়া দিয়াছে।

এরূপ তেজস্বিনী নারীর মধ্যেও নাট্যকার এক আকস্মিক এবং অসম্ভব পরিবর্তন ঘটাইলেন। মেবারের পরাজয়ের পর তাহারই মুখে মোগলের জয়-ধ্বনি শোনা গিয়াছে। একসময় কেবল রাজার জন্যই দেশের লোক যুদ্ধ করিত এবং রাজার পরিবর্তন ঘটিলে তাহা স্বচ্ছন্দে সকলেই মানিয়া লইত। কিন্তু সত্যবতীকে এইরূপ সাধারণের সহিত মিলাইয়া ফেলা উচিত হয় নাই। মেবারের বীর কন্যা পরাজিত হইয়াও পুনরায় রাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন দেখিবে ইহাই তো স্বাভাবিক। সত্যবতী কিন্তু পরাজয়ের পর একেবারে মোড় ফিরিয়াছে, হেদায়েৎ আলিকে সে বলিয়াছে, "মোগলের জয় হোক। যতদিন মেবার স্বাধীন ছিল, আমরা যুদ্ধ করেছি। এখন মেবার একবার যখন

অবনত শিরে মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করেছে, তখন মোগলের সঙ্গে আর আমাদের বিবাদ নেই।" পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সত্যবতীর অন্তরের স্বদেশপ্রেম নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সত্যবতীর এই পরিবর্তন মন মানিয়া লইতে চাহে না।

মানসী ঃ

কল্যাণীর অন্তরে যেমন স্বামীপ্রেমের প্রাধান্য, সত্যবতীর মধ্যেও সেইরূপ প্রাধান্য পাইয়াছে দেশপ্রেম। মানসীর জীবনে সার্থকরূপে দেখা দিয়াছে বিশ্বপ্রেম। সে ভিখারিণীকেও মা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার সঙ্গের বালকটিকে প্রত্যহ দেখিতে চাহে। মায়া মমতা প্রীতিতে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ।

পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে চায় মানসী। তাই সে অতিথিশালা খুলিয়াছে, নিজের হাতে অতিথিদের খাদ্য না দিলে তাহার মনের তৃপ্তি হয় না। রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও সে আহতদের শুশ্রূষার কাজ নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করে। যাহারা মৃত্যুবরণ করিবে তাহাদের জন্য কিছু করা কাহারও সাধ্য নয় কিন্তু যাহারা আহত হইবে তাহাদের দুঃখ লাঘব করিয়া সে সুখী হইতে চাহে। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিপদের দিনেও সে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করিয়া সেবাকার্যকে ব্যাপ্তি দান করে। মোগল-রাজপুতের দ্বন্দ্বে যে হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহার সমস্ত কার্যই যেন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চায়। পরহিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই তাহার লক্ষ্য, কল্যাণীকে সেকথা সে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে, "পরকে সুখী ক'রেই প্রকৃত সুখ। নিজেকে সুখী কর্বার চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়।"

অজয়কে মানসী ভালবাসিত, সেকথা স্পষ্ট প্রকাশ না পাইলেও তাহার আভাস অনেকবারই পাওয়া গিয়াছে। পরের জন্য জীবন উৎসর্গের আকাঙ্ক্ষায় সে ব্যক্তিগত জীবনের সুখের কথা স্মরণ করিতেও চাহে নাই। বিবাহকে সে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছে। বিশেষকে ছাড়িয়া সে নির্বিশেষের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। আঘাত তাহাকে পাইতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু জীবনকে এমন সামঞ্জস্য দান সে করিতে পারিয়াছিল যে সংযত হইতেও তাহার বিলম্ব হয় নাই। অজয়সিংহের মৃত্যুতে সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু নিজের অন্তরস্থ শক্তিতে নির্ভর করিয়া সে সহজেই নিজেকে

সংযত করিয়া লইল, "আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। আবার সমুদ্রের সেই মৃদু গম্ভীর অনাদি সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি—শতগুণ মধুর! মেঘ কেটে গিয়েছে।......আমার কর্তব্যপথ আজ জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে. বহুদূরে প্রসারিত দেখছি!" মানসী যে কতোখানি স্বস্থ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মানুষের সংসারকে মানসী মায়া বলিয়া মনে করে না: যদি তাহা মায়াও হয় তবে তাহা মনোহর, অপূর্ব। সংসারে বহু দুঃখী-লোভী মানুষ আছে, তাহাদের হৃদয়কে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করাকেই সে মানবজীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করে। প্রকৃতি জগতের সৌন্দর্য মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই—মানুষের ভিতরকার যাহা কিছু সুন্দর পৃথিবীর রশ্মি সুগন্ধ ঝঙ্কার তাহাই প্রতিনিয়ত গড়িয়া তুলিতেছে বলিয়া মানসী মনে করে।

মানুষ দীন-দুঃখী, যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করিতে পারে। তথাপি মানুষের জগতে কত না সংঘর্ষ! যাহাদের শোণিতের সঙ্গে মৃত্যুর বীজ মিশিয়া আছে তাহারা পরস্পরকে ভালো না বাসিয়া কি করিয়া ঘৃণা করে তাহা মানসী ভাবিয়া পায় না। মানুষের এই ক্ষুদ্রতা-হিংস্রতা মানসীর অন্তরে ঈশ্বরের উপর ক্ষোভ জন্মাইয়া দেয়। সে অভিযোগ করিয়া বলে, "মানুষ নির্বিবাদে মানুষকে হত্যা কর্চ্ছে, আর তুমি তাই নীরব হ'য়ে—দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ দয়াময়। নীল আকাশ ভেদ ক'রে বিশ্বে পাপের ভৈরব বিজয় হুঙ্কার উঠছে, আর এখনও তুমি তার গলা টিপে ধর্চ্ছ না!" এই ঈশ্বর বিশ্বাস-ই তাহাকে সংযত করিয়াছে, সমস্ত কিছু সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লইতে শিখাইয়াছে, পরাজিত পিতাকে তাই সে অতি সহজেই সান্ত্বনা দিতে পারিয়াছে। এই ঈশ্বর বিশ্বাস তাহার স্বজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করিয়াছে। চিত্র দেখিয়া সে তাই চরিত্র বলিয়া দিতে পারে। ঈশ্বর বিশ্বাস তাহাকে জ্যোতির্ময়ী শিখায় পরিণত করিয়াছে, অজয়ের প্রেম-দৃষ্টি সেই জন্যই মানসীর মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়াছে, "ঈশ্বর তোমার আত্মার প্রভায় সমুজ্জ্বল তোমার দেহখানিকে তোমার আত্মার আবরণ করে' গড়েছিলেন, পাছে সেই আত্মার অনাবৃত তীব্র-জ্যোতিঃ জগতের পক্ষে অসহ্য হয়।" মানসীর আচরণে ঐশী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, মানসী নিজেও তাহার মহৎ কর্মে প্রেরণার উৎস সন্ধান করিতে পারে নাই। রানা তাহাকে স্বর্গের রশ্মি বলিয়া মনে করিয়াছেন।

যুদ্ধে পরাজয়কে মানসী তুচ্ছ বলিয়া মনে করে। শোণিতপাত করিয়াও জাতি উন্নতি লাভ করে না। যে জাতির উদার বেগবান ধর্ম আচারের বন্ধনে আবদ্ধ হয় সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। ক্ষুদ্রতা, স্বার্থবোধই মানবজীবনে পতনের কারণ; উদারতা, ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ব্যতীত জাতির উন্নতি সম্ভব নয় ইহাই মানসীর দৃঢ় বিশ্বাস। জাতীয় জীবন হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিশ্বপ্রেম পুষ্ট হয়। রাজপুতে রাজপুতে সংঘর্ষ, ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হইতেই সমগ্র রাজপুতানা ধ্বংস হইয়াছে—সুতরাং মানবজীবনে পরস্পরের মধ্যে প্রেম ব্যতীত মানবজাতির উন্নতিও সম্ভব নয়। তাই মানসীর শিক্ষায় শিক্ষিত চারণীদের কণ্ঠে শোনা যায়, "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।"

মানসীর বিশ্বপ্রেম তাহার অন্তরে সমতা আনিয়াছে—সমস্ত ধর্মই এক অনাদি ধর্মের সহিত যুক্ত বলিয়া সে তাই মনে করে। প্রেমের জগতেও সুন্দর-কুৎসিতের ভেদ আছে বলিয়া সে মনে করে না, "প্রেমের রাজ্যে সুন্দর কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই।" ভালোবাসা কখনও পাপ হইতে পারে না।

মানসীর মধ্যে একটা ছেলেমানুষী ভাব আছে, উৎসাহ লাভের আশায় সে অন্যের প্রশংসা চায়; কল্যাণীকে সে বলিয়াছে, "আমায় প্রশংসা কর কল্যাণী। আমার কাজ অনুমোদন কর। আমার হৃদয়ে বল দাও", মেবারের রাজকন্যার স্তুতিপাঠ পথে-ঘাটে শোনা যায় অজয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া মানসী বলিয়াছিল, "আমি একদিন শুন্তে পাই না?" কিন্তু ছেলেমানুষী এবং কোমলতা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। আত্মপ্রচার যে সে সত্যই চায় না তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ছবিওয়ালীকে তাহার চিত্র অঙ্কন করিতে নিষেধ করায়। কর্তব্যের আহ্বান শুনিয়া সে সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হয়। অন্তরের প্রেরণা তাহাকে পথ নির্দেশ করে। কিন্তু চরিত্রটি সমস্ত মহিমা সত্ত্বেও প্রাণবন্ত, সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই।

গোবিন্দসিংহ :

সালুম্ব্রাপতি চন্দাবৎ সর্দার গোবিন্দসিংহ বীর সেনাপতি। প্রতাপসিংহের পার্শ্বে থাকিয়া তিনি বহু যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের গৌরব অর্জন করিয়াছেন। শত্রুর সহিত সন্ধি রানা প্রতাপ জানিতেন না, গোবিন্দসিংহও জীবনে

তাহা স্বীকার করেন নাই। সত্যকার স্বাধীনতার পূজারী যাঁহারা তাঁহারা স্বাধীনতা অপহরণের অপচেষ্টাকারী শত্রুকে কখনো বিশ্বাস করেন না। স্বাধীনতাই গোবিন্দের জীবনের আদর্শ, জীবন থাকিতে সেই আদর্শচ্যুত তিনি হইতে পারিবেন না। অথচ রানা অমরসিংহ সন্ধি করিতে ইচ্ছুক। সারা জীবন তরবারির ঝনৎকার, ভেরীর ভৈরব নিনাদ, অশ্বের হ্রেষা, মৃত্যুর আর্তধ্বনি শোনার পর সন্ধির প্রস্তাব গোবিন্দসিংহের নিকট অসহ্য মনে হয়। গোবিন্দ তাই বলিয়াছেন, "গোবিন্দসিংহ জীবিত থাক্‌তে সে স্বাধীনতা বিক্রয় করবে না।"

মোগল বার বার মেবার আক্রমণ করিয়াছে, বৃদ্ধ গোবিন্দও বার বার রানাকে উৎসাহ দিয়াছেন। লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা যায় না তাহা তিনি জানেন কিন্তু মৃত্যুর গৌরব তো কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খল মুক্ত রাখাই ছিল গোবিন্দের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা: জীবনদান অতি তুচ্ছ, কিন্তু জীবন দিয়াও মাকে রক্ষা করা যাইবে না ইহাই তাঁহার দুঃখ, "আমরা যুদ্ধ কবো। আমরা মরো কিন্তু দুঃখ এই যে, তবু মাকে বাঁচাতে পারবো না!"

দেশের সমৃদ্ধির কালে দেশের মানুষের সুখ-শান্তি বজায় রাখিবার জন্য রানা মোগলের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ-সিংহের নিকট এই সুখ-শান্তির কোন অর্থ নাই। মানবজীবনের আদর্শ সুখ-শান্তি নয়, মর্যাদাবোধ এবং আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা। পরাধীন জাতির পক্ষে এই দুইটির কোনটি করাই সম্ভব নয়। গোবিন্দের ধারণা সুখ-শান্তি ভীরুর আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে কিন্তু বীর কখনও স্বাধীনতার বিনিময়ে সুখ-শান্তি চাহেন না। তিনি নিজে স্বাধীনতার জন্য প্রতাপের পার্শ্বে থাকিয়া দুঃখের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছেন, বিপদের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছেন—"পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি দুঃখের পরম সুখ অনুভব করেছি।" নিজের মত করিয়াই তিনি সমস্ত জাতিকে দেখিতে চাহিয়াছেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষ নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগের আনন্দ অনুভব করিবে।

অমরসিংহের রাজত্বকালের সুখ-শান্তি-স্বচ্ছন্দতা অপেক্ষা প্রতাপের রাজত্ব-কালের যুদ্ধের ঝড়-ঝঞ্ঝা তাঁহার নিকট অনেক অধিক প্রিয় এবং গৌরবের। অতীত গৌরবের দেবতার কুটিরগুলি ভাঙিয়া সম্ভোগের নাট্যভবন নির্মিত হইতেছে দেখিয়া গোবিন্দসিংহ শোকগ্রস্ত। এই আদর্শের পরিবর্তন গোবিন্দ-

সিংহ একেবারেই সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই ব্যথিতচিত্তে তিনি বলিয়াছেন, "এখন দেখ্‌ছি একটা ম্রিয়মান গৌরব মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ নেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।" তথাপি তিনি পূর্ব গৌরব রক্ষার জন্য ঐশী শক্তির সহায়তা চাহিয়াছেন, "মেবার! মোগল-প্রভুত্ব স্বীকার কর্‌বার আগে একটা বিরাট ভূমিকম্পে ধ্বংস হ'য়ে যাও।" নিজেদের পুরুষকারের উপরও ভরসা তাঁহার কম নয়, আত্মশক্তিকে এড়াইয়া কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিতে তিনি কিছুতেই চাহেন নাই, "সামন্তগণ প্রতাপসিংহের পুত্রকে এ অপযশ থেকে রক্ষা কর। দূর কর এ বিলাস, ভেঙে ফেল এসব খেল্‌না।" গোবিন্দসিংহের ব্যক্তিত্বের পরিচয় উৎসাহ-উদ্দীপনা দিবার ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া পাওয়া গিয়াছে।

গোবিন্দসিংহের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এত অধিক যে মেবার স্বাধীন থাকাকালীনই তিনি মৃত্যুবরণ করিতে চাহেন। অশক্ত দেহেও তিনি মহাবৎকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন নিতান্তই মৃত্যুলাভের আকাঙ্ক্ষায়। জামাতা মহাবৎ দেশের শত্রু বলিয়া তাঁহার অন্তর অত্যন্ত বেদনার্ত ছিল—জীবন থাকিতে তিনি কিছুতেই মহাবৎকে উদয়পুরের দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবেন না। বহু যুদ্ধের বীর নায়ক সামান্য সৈনিকের হাতে মৃত্যু চাহেন নাই; গৌরবপূর্ণ, মহিমময় মৃত্যুই ছিল তাঁহার কাম্য।

মুসলমানের বিরুদ্ধে গোবিন্দসিংহের ক্রোধ নিছক জাতিবৈরিতা মাত্র নয়। মোগলের জিগীষা দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই, দস্যুর ন্যায় বার বার তাহারা মেবারকে পদদলিত করিতে চাহিয়াছে। আক্রমণকারী মোগলের স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা দেখিয়াই তিনি ঘোরতর মোগল বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন—সেই মোগল-বিদ্বেষই মুসলমান বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। এই আক্রমণকারী মুসলমানের সহায়ক মাত্রই গোবিন্দের নিকট ঘৃণ্য অধম বলিয়া বিবেচিত। কন্যা স্বামী বলিয়া এখনও মহাবৎকে পূজা করে জানিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ—জীবনে যিনি স্বাধীনতার আদর্শচ্যুত হন নাই তাঁহার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তাই কন্যার মনোভাব অসহ্য মনে হওয়ায় তাহার প্রতি গভীর স্নেহ-প্রীতি সত্ত্বেও তিনি তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ দেন। তাঁহার দেশাত্মবোধ পতিব্রতার অন্তরের সত্যকে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দেয় নাই। আঘাত পাইয়া তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে যত বিরোধিতাই থাকুক না কেন কাহারও

অন্তরের গভীর নিষ্ঠাকে অপমান করিতে নাই। কল্যাণীকে সেই জন্যই তিনি পুনরায় বক্ষে টানিয়া লইয়াছিলেন।

অন্তরের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ধরিয়া রাখিবার মতো শক্তি গোবিন্দের দেহে তখন ছিল না। তরবারি ধারণ করিয়া মোগলকে বাধা দিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে কিন্তু বৃদ্ধের অশক্ত হাতে তরবারি আর ঘোরে না, দেহ টলিয়া যায়—ইহাই গোবিন্দসিংহের জীবনের ট্র্যাজেডি: "আজ আর আমার সেদিন নাই।…এই জরা বিকম্পিত হস্তে আমার সে তরবারি আর সোজা ধ'রে রাখতে পারি না।" অথচ গোবিন্দসিংহের পক্ষে সেদিনটির আজ কতনা প্রয়োজন ছিল!

কিন্তু এই বীর চরিত্রটিকে নাট্যকার শেষ রক্ষা করিতে দেন নাই। পুত্রের মৃত্যুতে তিনি সম্পূর্ণ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। কন্যা গৃহ ছাড়া, পুত্র মৃত—দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু বীর পুত্রের আর্তরক্ষায় মৃত্যুবরণে গোবিন্দসিংহের পক্ষে এরূপ বিচলিত হওয়া কিছুতেই শোভন হয় নাই। দেশের জন্য প্রাণ দান যাঁহার জীবনের আদর্শ, পুত্রের মৃত্যুর ব্যথা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেও বীর পুত্রের মৃত্যুর গৌরবও তো তিনি অনুভব করিবেন। গোবিন্দ-সিংহের মধ্যে সে ভাব একেবারেই দেখা যায় নাই। এই মৃত্যু তাঁহার জীবনের মূল ভিত্তি যেন নাড়াইয়া দিয়াছে: ইহা বীর হৃদয়ের পরিচায়ক নহে। দৃশ্যটিকে করুণ করিয়া তুলিবার আগ্রহে নাট্যকার চরিত্রটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন।

প্রতাপসিংহের পার্শ্বে থাকিয়া বহু বৎসর যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলেও গোবিন্দসিংহও যেন মনে করেন একবার পরাধীন হইলে চিরকাল তাহাই থাকিতে হইবে। পরাভূত হইলেও পুনরায় স্বাধীন হইবার যে চেষ্টা করিতে হয় ইহা যেন তাঁহার অজানা ছিল—"অজয়, মোগল দিল্লীর রাজা, জানি। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ, জানি। কিন্তু মেবার রাজ্য এখনও স্বাধীন।" অর্থাৎ একবার পরাধীন হইবার পর স্বাধীন হইবার চেষ্টাকে তিনি বিদ্রোহ এবং পাপ বলিয়া মনে করেন। ইহা সে সময়কার সাধারণ মানুষের কথা হইতে পারে কিন্তু স্বাধীনচেতা বীরের মনোভাব কিছুতেই নয়। সুতরাং চরিত্রটিতে যে অসংগতি দেখা দিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সগরসিংহ ঃ

স্বার্থপর সগরসিংহ মৃত্যু ভয়ে ভীত ছিলেন। স্বার্থ তাঁহাকে জীবন রক্ষা করিবার মন্ত্রটি শিখাইয়াছিল। তাই দেশ পরিত্যাগ করিয়া তিনি মোগলের দাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। যুদ্ধ এবং দুঃখ স্বীকার তাঁহার পক্ষে ভয়ের বিষয় ছিল। দেশের ইতিহাস বা ঐতিহ্য সম্বন্ধেও তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু সুবিধা পাইলেই নিজের ভীরুতা তিনি গোপন করিতে চাহিতেন, অরুণকে তাই তিনি দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার যুদ্ধ কর্তে কর্তেই জীবনটা কেটে গেল।" বিপদে পড়িলে অতি সহজেই অবশ্য তিনি নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিতেন না। তাঁহাকে চিতোরের দুর্গে গিয়া রানা হইয়া বসিতে হইবে শুনিয়া ভীত-চকিত হইয়া স্বীকার করিলেন, "যুদ্ধ পাছে কর্তে হয়, সেই ভয়ে আমি নির্বিবাদে মোগলের কাছে এসে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম।" প্রাণ রক্ষাই তাঁহার একমাত্র সমস্যা ছিল—সর্বপ্রকার খ্যাতিও তিনি তাহার তুলনায় তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতেন। চারণ-চারণীরা প্রতাপের কীর্তিগাথা গাহিয়া বেড়াইতেছে এই কথা শুনিয়াও তাঁহার কোন পরিবর্তন হয় না—মৃত্যুর পর সেই গান শুনিবার উপায় নাই। সুতরাং যে গান তিনি শুনিতে পারিবেন না তাহার জন্য মৃত্যুবরণ তিনি মূর্খতা বলিয়াই মনে করেন। তবে মূলতঃ সগরসিংহ মন্দ লোক ছিলেন না, যুদ্ধ করিতে অর্থাৎ প্রাণ দানের ভরসা যদি তাঁহার থাকিত তবে তিনি নিশ্চয়ই দেশ পরিত্যাগ করিতেন না, "যুদ্ধ যদি কর্তে হবে, ত' নিজের দেশের পক্ষ হ'য়ে না লড়ে' তার বিপক্ষেই যুদ্ধ কর্তেই বা যাবো কেন?" সুতরাং তাঁহার মধ্যে দেশাত্মবোধ একেবারে ছিল না তাহা নহে; সাহসের অভাবই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কলঙ্ক এবং এই দোষই তাঁহার চরিত্রের সমস্ত ত্রুটির মূলে লক্ষিত হয়।

মোগলের চরিত্রও তিনি জানিতেন—কোরাণে যে উদারতার কথা আছে তাহা মুসলমানরা বড় অনুসরণ করিত না। ধর্মের মহৎ প্রেরণা এবং উদারতার পরিচয় দিয়া তাহারা বিধর্মীকে মুসলমান করিত তাহা নহে, রাজনৈতিক কারণে বলপ্রয়োগে হিন্দুকে মুসলমান করাই ছিল তাহাদের নীতি। হিন্দু ধর্মের প্রতি সগরের প্রীতিই তাঁহাকে মুসলমান হইতে দেয় নাই। মোগলকে বা মুসলমানদের বড় মনে করিয়া তিনি তাহাদের পক্ষে যোগ দেন নাই—তাহাদের শক্তিশালী মনে করিয়াই তিনি দেশত্যাগ করিয়াছিলেন।

নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন তাঁহাকে চিতোর দুর্গে যাইতে হইল তখন

তিনি অন্তরের গভীরে পরাধীনতার বেদনা অনুভব করিলেন। বুঝিলেন যে তিনি মোগলের হাতের যন্ত্র মাত্র, শান্তি লাভের আশায় তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন তাহা শান্তির প্রকৃত পথ নহে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাই তিনি আবদুল্লাকে বলিয়াছিলেন, "এই অত্যন্ত নীচ কাপুরুষের কাজ—মুঠোর মধ্যে আমাকে পেয়ে—শেষে রাণা করিয়ে দেওয়া।"

কিন্তু চিতোর দুর্গে একরকম কয়েদ থাকার দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও সগরসিংহের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। এইখানেই তাঁহার জীবনবোধে আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। রাজপুতের জীবনযাত্রার ইতিহাস, হিন্দুর মহৎ ধর্মভাব তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। রাজপুতের দেশাত্মবোধ, মাতৃভূমির জন্য তাহাদের আত্মদান তাঁহাকে নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিল। অপরাধ-সচেতন হইয়া ওঠায় কল্পনায় তিনি পূর্ব পূর্ব বীরদের দেখিতে লাগিলেন, প্রতাপের খড়্গের বিদ্যুৎ ঝলক তাঁহার অন্তরের কুজ্ঝটিকা দূর করিয়া দিল। অকপট চিত্তে তিনি স্বীকার করিলেন, "আমার আজ চোখ ফুটেছে। আমি আজ মাকে চিনেছি। আজ থেকে পরদত্ত নিগৃহীত রূপা হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আজ থেকে দেশের সঙ্গে দুঃখ দারিদ্র্য, অনশন বেছে নিলাম।"

চিতোর দুর্গ তিনি অমরসিংহের হাতে তুলিয়া দিয়া ফকির বেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা রানাকে দিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। ইহা বিশ্বাসঘাতকতা নয় কারণ ন্যায় যুদ্ধে চিতোর দুর্গ আকবর অধিকার করেন নাই। সগরের ন্যায়-অন্যায় বোধও জাগিয়া উঠিয়াছিল—সমস্ত মানুষটাই যেন মহৎ উদাহরণের প্রেরণায় জাগ্রত হইয়ছিল। ভিতরের মানুষটার জাগরণে তাঁহার স্বার্থবোধ, ভয় এবং কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা দূর হইয়া গিয়াছিল। যিনি তরবারি ধরিবার ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন তিনিই স্বেচ্ছায় অপরিচিত কল্যাণীকে রক্ষা করিতে দস্যুদলের অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন।

আত্মত্যাগের পথে পদক্ষেপ মাত্রই সগরের কর্ণে দেশের আহ্বান পৌঁছিয়া গেল: আজ মাতৃভূমির ভাবরূপ দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ। যে রূপ তিনি দেখিয়াছেন সে রূপ তিনি পুত্র মহাবৎ খাঁকেও দেখাইতে চাহেন। তিনি মুসলমানের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন বলিয়াই মহাবৎ মুসলমান

হইয়াছিলেন। উভয়েরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। সগর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াছেন, মহাবৎকেও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তাঁহারই, "আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্চ্ছি। আর তোমায় বল্‌তে এসেছি, যে তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

সগরসিংহের সত্য দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে তাই মহাবতের ন্যায় তিনি হিন্দুর বিকৃত আচরণের সন্ধান করিয়া বেড়ান নাই, তিনি হিন্দু ধর্মের গভীর সত্যটুকু দেখিয়া লইয়াছেন। হিন্দু ধর্মের উদারতা, তাহার বিশ্ববোধ, তাহার আত্ম-সংযমের উপদেশ, অহিংসা এবং সর্বজীবে সমতাবোধ তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন: কোন ধর্মের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষ নাই ইহাও তিনি বুঝিয়াছেন। উচ্চ আদর্শবাদ তাঁহার মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটাইয়াছে যে সত্যের জন্য প্রাণ-দান এখন তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গেছে। সম্রাটের রাজকীয় মর্যাদাও আর তাঁহার নিকট ভীতিজনক নয়, তিনি এখন সত্যের দৃঢ়তায় দণ্ডায়মান। রাজপুতের, হিন্দুর জীবন-কথা, ন্যায় পরায়ণতা, ত্যাগশীলতা তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—স্বার্থ আর তাঁহার পথরোধ করিতে পারে নাই। তাই হাস্যমুখে তিনি প্রাণ দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্তই কেবল করিয়া গেলেন তাহাই নহে, মানব সাধারণের সম্মুখে এক মহৎ আদর্শও স্থাপন করিয়া গেলেন। দস্যু যে সত্যই বাল্মীকি হইয়া উঠিতে পারে তাহার আর একটি প্রমাণ তিনি উপস্থিত করিলেন। সাধারণ মানুষের মনে এই চরিত্রটি চিরকাল প্রেরণা যোগাইবে: দুর্বল মানুষেরও যে হতাশ হইবার কারণ নাই সগরসিংহ যেন তাহাই দেখাইয়া গেলেন।

মেবারের সাধারণ মানুষ:

নাট্যকার মেবারের সাধারণ মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইয়া-ছেন। উদয়পুর দুর্গের নিকটে যাহারা থাকে তাহাদের সহিত দূরস্থ গ্রামের অধিবাসীদের চরিত্রের পার্থক্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। দুর্গের নিকটস্থ অধিবাসীদের সাহস এবং চিত্তের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এক যুদ্ধ হইতে আর এক যুদ্ধের মধ্যে যে 'হোরি' উৎসব তাহাতে এখানকার রমণীগণ অতি সহজেই মাতিয়া উঠিয়াছে—ইহাদের মনে যুদ্ধ কোন ভীতি সঞ্চার করে নাই। রাজপুত রমণীর উপযুক্ত করিয়াই উদয়পুর দুর্গের আশে পাশে যাহারা বাস করে তাহাদের চরিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। কেবল নারীচিত্তের

সহজভাবই নয়, পুরবাসীদের মনেও ভীরুতার চিহ্ন মাত্র দেখা যায় নাই। মেবারের পরাজয়ের পরও গজসিংহের সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষ করিতে তাহারা ভীত হয় নাই।

কিন্তু দূরস্থ গ্রামবাসীদের মনে সাহসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বিজয়ী মেবারের এক স্থানে মুসলমান সৈন্যের দৌরাত্ম্য মেবারবাসীদের পক্ষে কিছুমাত্র গৌরবের কথা নয়। মোগলের পরাজয় সত্ত্বেও মুসলমান দস্যুরা পথিককে আক্রমণ করিতে সাহস পায়, ইহাতে মনে হয় মেবারের সাধারণ মানুষ ভীরু হইয়া পড়িয়াছিল।

চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মেবারের পল্লীবাসীদের কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—সেক্সপীয়রের 'জনতা' চরিত্রের অজ্ঞতা-দুর্বলতার ছাপ ইহাতে পড়িয়াছে: মেবারের সাধারণ মানুষ অন্য নাটকের সাধারণ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানার সাধারণ মানুষই রানাদের সৈন্য সমস্যা সমাধান করিত, তাহারা কোনকালেই ভীরু ছিল না: চারণদের সংগীত চিরকাল তাহাদের প্রেরণা দিয়াছে। অমরসিংহের সুখ-সমৃদ্ধির কালে হয়তো মেবার-বাসীদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আসিয়াছিল কিন্তু অমরসিংহের সময়েও তো পরপর কয়েকটি যুদ্ধে মেবার জয় লাভ করিয়াছিল। প্রথম যুদ্ধ হইতে শেষ যুদ্ধের ব্যবধান প্রায় ৬।৭ বৎসর। সুতরাং প্রথমদিকে দুর্বলতা থাকিলেও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পল্লীবাসীদের মনে পুরাতন গৌরববোধ নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিয়াছিল। অথচ মেবারের সমস্ত গ্রামবাসী চূড়ান্ত ভীরুতার পরিচয় দিয়াছে। জনতার চরিত্র সেক্সপীরীয় ছাঁচে অঙ্কিত করিতে গিয়া নাট্যকার মেবারের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন।

সমস্ত পল্লীবাসীই মূলতঃ ভীরু, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেহ কেহ মেবারের সর্বনাশের কথা উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়ে। দেশ এইবার গেল, গ্রামে আগুন লাগিয়াছে, গ্রামবাসীদের চীৎকার শোনা যাইতেছে সুতরাং এইবার পলায়ন করাই ভালো—নিজের ভবিষ্যতের কথাও ইহারা চিন্তা করে না। আর একদল আছে যাহারা নাম শুনিয়াই মূর্চ্ছা যায়, মহাবৎ যখন নিজে আসিয়াছে তখন আর রক্ষা নাই, রক্ষা পাইবার চেষ্টাও বৃথা: বিপদ শিয়রে উপস্থিত এই সংবাদটুকু রাষ্ট্র করিয়া পলায়ন করিতে তাহারা ব্যস্ত হয়। কেহ কেহ দম্ভ প্রদর্শন করিতে ছাড়ে না এবং নিজেরা অযথা তর্ক করিলেও অপরকে তার্কিক বলিয়া অভিযোগ করে।

কিন্তু ভীরুতায় সকলেই সমান—পলায়নে কেহ পিছে পড়িয়া থাকিতে চাহে না।

'মেবার-পতন' নাটক ও ইতিহাস :

'মেবার-পতন'-এ টডের গ্রন্থকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু টডের গ্রন্থ ইতিহাস নহে। সেই জন্য 'মেবার-পতন'-এ ইতিহাস অনেকটাই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতি অনেক দিক দিয়াই ইতিহাস হইতে নাটকটি অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে।

নাট্যকার অমরসিংহকে বিলাসী বলিয়া প্রথমে নির্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু যতদূর ইতিহাস জানা গিয়াছে তাহাতে ইহা সমর্থিত হয় না। অমরসিংহ বিলাসী হইয়া উঠিবার সময়ও পান নাই। প্রতাপের মৃত্যুর পর আকবর সেলিমকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেলিমের মেবার জয়ের তখন বিশেষ আগ্রহ ছিল না—দিল্লীর সিংহাসনই তখন তাঁহার বড় আকর্ষণ হইয়া উঠিয়াছিল। মোগলের অবশ্যম্ভাবী আক্রমণের আশঙ্কায় রানা নিজেকে বিশেষভাবে প্রস্তুতও করিতেছিলেন। সৈন্য-বাহিনী গঠন এবং অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণে যিনি নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তিনি যে বিলাসী হইবেন তাহা স্বীকার করা যায় না।

নাট্যকার টডকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে সালুম্ব্রাপতি রানাকে উদ্দীপিত করিয়া তোলেন ঃ রানা এই সময়ে উদয়পুরে ছিলেন। কিন্তু ইহা নিতান্তই কল্পনা বলিয়া মনে হয় কারণ রানা তখন উদয়পুরেই ছিলেন না, তখন তিনি সাভান্দ-এ বাস করিতেছিলেন। সালুম্ব্রাপতি চন্দাবৎ গোবিন্দসিংহও রানার সেনাপতি ছিলেন না—সেনাপতি ছিলেন হরিদাস ঝালা।

সগরসিংহ প্রতাপসিংহের ভ্রাতা, ইতিহাস তাহা স্বীকার করে। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মোগলের জায়গীরদার রূপে রানা উপাধি দিয়া চিতোরে প্রেরণ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তিনি চিতোর দুর্গ অমরসিংহের হাতে তুলিয়া দেন নাই। অমরসিংহের সহিত সম্রাটের যখন সন্ধি হইল তখন সগরকে চিতোর ত্যাগ করিতে হয়। প্রথমে তাঁহাকে মধ্য-ভারতে প্রেরণ করা হয় এবং পরে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করিয়া তিনি বিহারে আসেন। ১৬১৭ খ্রীঃ তিনি মারা যান। নাট্যকার তাঁহাকে যে মৃত্যুর গৌরব দিয়াছেন টডের গ্রন্থই তাহার

ভিত্তি—ইহা ঐতিহাসিক সত্য নয়। মহাবৎ খাঁ সগরের পুত্র মহীপৎ নহেন। টড তাঁহাকে সগরসিংহের পুত্র বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্ত।

মোগলের সঙ্গে সন্ধির সময় অমরসিংহ পুত্রকে সিংহাসন দিয়া নির্বাসন বরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন—নাট্যকারের এই কল্পনারও ভিত্তি টডের গ্রন্থ। কিন্তু ঐতিহাসিক অনুমান এই যে সন্ধির পর অমরসিংহ বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৬২০ খ্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র করনসিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নাট্যকার যুদ্ধের যে ক্রম বর্ণনা করিয়াছেন ইতিহাসের সহিত তাহারও পার্থক্য আছে। নাট্যকারের মতে মেবার আক্রমণে প্রথম সৈনাপত্য লাভ করে জাহাঙ্গীরের ভাগীনেয় খাঁ খানান ফেদাসেং আলি খাঁ, দ্বিতীয় আক্রমণ হয় সায়েদ্ আবদুল্লার সৈনাপত্যে, তৃতীয় আক্রমণ করেন সাহজাদা পরভেজ এবং চতুর্থ অর্থাৎ শেষ আক্রমণে নেতৃত্ব করেন স্বয়ং মহাবৎ খাঁ। কিন্তু ইতিহাসের ক্রম অন্যরূপ। ইতিহাস বলে যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই সাহজাদা পরভেজ আসফ খাঁ এবং জাফর বেগের সহযোগিতায় মেবার আক্রমণ করেন। ইহাদেরই সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে সগরসিংহকে প্রেরণ করা হয়।

প্রায় তিন বৎসর পরে মহাবৎ খাঁ মেবার আক্রমণ করেন। তিনি প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিলেও শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রচুর রণসম্ভার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়; ফিরিবার পূর্বে তিনি সগরসিংহকে চিতোরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসেন। পরের বৎসরই মেবার আক্রমণ করে মোগল সেনাপতি আবদুল্লা। তিন বৎসর পর মোগল সেনাপতি রাজা বাসু মেবার আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হয়।

পরের বৎসর খুরম্ মেবার আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ বীভৎসতার জন্য খ্যাত: মোগলরা নির্দয়ভাবে মেবারবাসীদের হত্যা করে, মৃতদেহ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল—বহু সংখ্যক নারী এবং শিশুকে দাসরূপে বিক্রয় করা হয়। রানাকে শেষ পর্যন্ত সন্ধি করিতে হইয়াছিল। নাট্যকার সত্যবতী ও চারণীদের সংগীতে সাজাহানের যোগ দিবার কথা কল্পনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার আদর্শ রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল—ইতিহাসের সহিত তাহার কোন যোগ নাই।

গজসিংহও ঐতিহাসিক চরিত্র, তবে তিনি বীর বলিয়াই খ্যাত ছিলেন। রানা অমরসিংহের সভাকবির নাম নাট্যকার দিয়াছেন কিশোরদাস কিন্তু তাঁহার নাম ছিল জীবধর।

'মেবার-পতন' ও ঐতিহাসিক নাটক :

ইতিহাস অনেক নাটকীয় উপাদান সরবরাহ করিতে পারে। জাতীয় জীবনের নানা সংঘর্ষ, নানা পরিবর্তন ইতিহাস নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, গভীর ভাবব্যঞ্জক নাটক এইগুলিকে অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে রচিত হইতে পারে। বর্তমান অবস্থা অথবা স্তিমিত পরিবেশ নাটক রচনার সুযোগ সৃষ্টি করে না কিন্তু অতীত নাট্যকারদের আবেগ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের জাতীয় চেতনা উদ্বোধনের দাবী নাট্যকারদের এক সময় অতীত মুখী করিয়াছিল। 'মেবার-পতন' তাহারই ফল।

কোন ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া সমসাময়িক সমাজের রীতি-নীতি, সংস্কার, ঘটনাবলী প্রভৃতি বজায় রাখিয়া যে নাটক রচিত হয় তাহাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে। ঐতিহাসিক চরিত্রের স্থলে যদি কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া নাটক রচিত হয়, যদি সেই ঘটনার আবর্তে পড়িয়া নাটকের নরনারীরা আবর্তিত হইতে থাকে এবং নাটক পাঠান্তে যদি সেই ঘটনার রেশই প্রধান হইয়া ওঠে তবে তাহাকেও ঐতিহাসিক নাটক বলিব। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে নাটকে নরনারীর জীবনের কথা বলা হয়, যেখানে নরনারীর মনোভাবই প্রধান হইয়া ইতিহাসের রথে চড়িয়া ব্যাপ্তি লাভ করে মাত্র সে নাটক ঐতিহাসিক বলিয়া চিহ্নিত হইবার নহে। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসই নরনারীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে ; যাহা স্পষ্ট জানা নাই তাহা কল্পনার দ্বারা নাট্যকার পরিপূর্ণ করিয়া লইতে পারেন। ইতিহাসকে পূর্ণতা দিবার জন্য নূতন চরিত্র সৃষ্টির অধিকারও তাঁহার আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাসকে বিকৃত করিবার অধিকার নাই—নাট্যকার ইতিহাসের ফলশ্রুতিও পরিবর্তন করিতে পারেন না।

'মেবার-পতন' নাটকে অনেকগুলি ঐতিহাসিক চরিত্র আছে : ঘটনার মধ্যে ইতিহাসও যথেষ্ট। মেবার আক্রমণের ক্রম হয়তো যথাযথ রক্ষিত হয়

নাই, মহাবৎ খাঁ মেবার জয় করেন নাই তাহাও সত্য : মহাবৎ মহীপৎ নয় তাহাও নিশ্চিত। তাহা সত্ত্বেও ইতিহাসের নানা ঘটনা এই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র এবং নানা ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও নাট্যকারের উদ্দেশ্য ইতিহাসকে অনেকদূর অতিক্রম করিয়া গেছে। সাজাহান মেবারের চারণীদের উৎসাহ দেন নাই। ইহাতে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহাই নহে হিন্দু-মুসলমানে মিলনের যে আদর্শ নাট্যকারের অন্তরে ছিল তাহাই প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহা ইতিহাসের কথা নয়, নাট্যকারের সমসাময়িক কালের জাতীয় চেতনা হইতে জাত।

ইতিহাসের অমরসিংহ এবং নাটকের অমরসিংহের মধ্যেও পার্থক্য যথেষ্ট। ইতিহাস অমরসিংহের ভাগ্য গড়িয়াছে—নাটকের অমরসিংহ ইতিহাসকেও অনেকখানি অতিক্রম করিয়া গেছেন, তাঁহার মনের বিশেষ ভাব ইতিহাসের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

সর্বোপরি 'মেবার-পতন' মেবারের পতনের কথা হইলেও মানবজীবনের সার্থকতার কথাই শুনাইয়াছে। বেদনা অপেক্ষা ইহাতে আশার বাণীই প্রধান। মানসীর বিশ্ববোধ জাতীয়তাকে অতিক্রম করায় নাটকের ফলশ্রুতি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেছে। ইতিহাসের ঘটনার উপর প্রশান্তির ছায়া নামিয়াছে। নাটক শেষ হইলে ইতিহাস ভুলিয়া যাই, মানুষ হইয়া উঠিবার কথাটিই প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং 'মেবার-পতন'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। ইহাতে ইতিহাসের ভিত্তিতে নাট্যকারের এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে রূপদান করা হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যের জন্য ইতিহাসকেও প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাই ইহাকে ইতিহাস ভিত্তিক সমকালীন মানুষের আদর্শমূলক নাটক বলাই বাঞ্ছনীয়।

'মেবার-পতন' নাটকে মেবারের ভূমিকা :

মোগল বার বার মেবার আক্রমণ করিয়াছে, যে কোন মূল্যে মেবার তাহারা অধিকার করিবেই—মেবার ধ্বংস হইলেও তাহাদের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। মোগলের নিকট মেবার একখণ্ড ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নয়। মেবার জয় করিয়া দিগ্‌বিজয়ীর গৌরব অর্জন করাই তাহাদের কাম্য। কিন্তু মেবার রাজপুতের নিকট ভূমিখণ্ড মাত্রই নয়। বিভিন্ন ব্যক্তিকে মেবার বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

মহাবতের নিকট মেবার জন্মভূমি মাত্র ; তাই মেবার জয়ের প্রস্তাব তাঁহার ঠিক পরিপাক হয় না। মেবারকে মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিতে পারিলে তিনি কখনও গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করিতে পারিতেন না। জন্মভূমি বলিয়া মেবার আক্রমণ করিতে তাঁহার সংস্কারে বাধিতেছিল, কিন্তু তাঁহার অহং সেই সংস্কার অতিক্রম করিয়াছিল। রক্তাক্ত মাতৃভূমির স্বরূপ তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। সগরসিংহের অবস্থাও প্রথমে এইরূপই ছিল। দেশের জন্য প্রতাপের প্রাণ উৎসর্গকে তিনি মূর্খতা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু চিতোর দুর্গে থাকিয়া ক্রমে তাঁহার চৈতন্য হইল। দেশের পুরাতন ঐতিহ্য, চারণীদের গৌরব গান—অরুণ এবং সত্যবতীর আকর্ষণ তাঁহার নিকট মেবারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। মিথ্যা স্বপ্ন ভাঙিয়া তিনি যেন জাগিয়া উঠিয়া মাকে চিনিতে পারিলেন। মেবারের সুন্দরী জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি তাঁহাকে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিবার প্রেরণা দিল।

অরুণ দিল্লীতে যাহা অনুভব করে নাই চিতোর দুর্গে আসিয়া তাহাই বুঝিতে পারিল। প্রতি পাহাড়ে সে পূর্বপুরুষের স্মৃতির পরিচয় পাইয়াছে। শত উদ্ধত স্বর্ণ মসজিদের অপেক্ষা দেশের একটি ভগ্নমন্দিরও আজ তাহার নিকট প্রিয়তর বলিয়া মনে হয়। তাই সে মাতার সহিত দেশমাতৃকাকে রক্ষার কার্যে নিযুক্ত হইল। সত্যবতীর স্বজ্ঞায় দেশ একদিন মাতৃরূপে ধরা দিয়াছিল—তাই সে মেবারের জন্য তাহার জীবনের সমস্ত সুখ তুচ্ছ করিতে পারিয়াছে। দেশমাতৃকা অমূল্যরত্ন : মাতার সেই ভাবমূর্তি তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে.

গোবিন্দসিংহ তাঁহার যৌবন কাল হইতেই দেশমাতার জন্য নিজেকে বলিপ্রদত্ত বলিয়া মনে করেন। মাকে যেমন করিয়া শত্রুর নিকট হইতে আড়াল করিয়া রাখিতে হয় গোবিন্দসিংহও মেবারকে সেইরূপ আবৃত করিয়া রাখিতে চাহেন। তাঁহার জীবিত কালে কাহাকেও তিনি মায়ের দেহে হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না। দেশের মানুষের সুখের কথা নিশ্চয়ই ভাবিতে হইবে কিন্তু মাতার দেহে আঘাত করিয়া সে সুখের কল্পনা তিনি করিতে চাহেন না : মায়ের বেদনাও দূর করিতে হইবে। বেদনার্ত মাতার শেষ হৃৎস্পন্দন যেন তিনি শুনিতে পাইতেছেন। মেবার তাঁহার ভাবদৃষ্টিতে মানবী-মূর্তি ধারণ করিয়াছে, 'এখন দেখ্‌ছি একটা ম্রিয়মাণ গৌরব মৃত্যুশয্যায় শুয়ে

আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ-নেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।" গোবিন্দসিংহের সমস্ত কার্যই মেবারকে কেন্দ্র করিয়া। রানাকে তিনি রীতি লঙ্ঘন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন দেশমাতাকে রক্ষার জন্য, কন্যাকে বিসর্জন দিয়াছেন দেশমাতৃকার শত্রুকে পূজা করিবার জন্য—প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন মায়ের অপমান সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া।

অমরসিংহের নিকট প্রথমে দেশ মাতা হইয়া ওঠে নাই। প্রজাদের সুখ-শান্তির কথাই প্রথমে তাঁহাকে কার্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। মেবার তখনো তাঁহার নিকট ভূমিখণ্ড মাত্র। গোবিন্দসিংহ ও সত্যবতীর উৎসাহে তিনি প্রথম যুদ্ধ করিয়াছেন। সত্যবতীর জীবন-উৎসর্গের মহিমা দেখিয়া তিনি দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি এখন প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কিন্তু মেবারের মাতৃমূর্তি এখনো তিনি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু ক্রমে রানার ভাবদৃষ্টির উদয় হইল। মোগলের আঘাতের পরে আঘাতে রক্তাক্ত মেবারের রূপ এক অপরূপ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইল—তিনি ইহার মধ্যে আহত যন্ত্রণাকাতর নারী মূর্তি দেখিতে পাইলেন। ধ্বংসের সহিত যেন এই সুন্দরীর বিবাহ হইতে চলিয়াছে। বেদনার্ত রানা উন্মাদের ন্যায় কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গভীর দুঃখের দিনে রানা মেবারের পরিপূর্ণ মাতৃমূর্তি দেখিলেন। গৌরবের দিনে ফেনায়িত উচ্ছ্বাস অনেকসময় সম্পূর্ণ সত্য দেখিতে দেয় না—দুঃখের মধ্যেই বিষাদময়ীব তপস্যাক্লিন্ন রূপের দ্যুতি প্রকাশমান হয়—মেবারের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। রানা দুঃখের দিনে মাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লইলেন।

কয়েকটি সংগীতের মধ্যেও মেবার সুন্দরীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—মেবার সুন্দরীর সমকক্ষ তো কেহই নাই!

মেবার সুন্দরী সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে থাকিয়া চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। মাতৃদেহের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য উৎসাহে উদ্দীপিত বীরেরা প্রস্তুত হইয়াছেন—আক্রমণকারী রাক্ষসদের সহিত তাঁহাদের বিরোধ। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের সহিত দেশমাতৃকার আনন্দিত এবং বেদনার্ত মূর্তিও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—নাটকের অগ্রগতির সহিত দেশমাতার ভাব পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে। সুতরাং এক হিসাবে মেবার-জননীকে এই নাটকের নায়িকা বলা যায়।

'মেবার-পতন'-এ কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল :

অনেকেই দ্বিজেন্দ্রলালকে হাস্যরসিক কবি হিসাবেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। 'মেবার-পতন'-এ হাস্যরসের সংগীত না থাকিলেও সর্বসমেত এগারটি সংগীত আছে। কথায় যে কাজ হয় না সংগীতে সে কাজ সহজেই সিদ্ধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা জানিতেন। তাই পল্লীবাসীদের উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সত্যবতী ও চারণীদের কণ্ঠে তিনি 'মেবার পাহাড়' গানটি দিয়াছেন: সংগীতটির ভাষা এবং সুর একেবারে মানুষের মর্মে আবেদন পৌঁছাইয়া দেয়। মেবারের অবস্থা বিপর্যয়ের সহিত সমতা রাখিয়া তিনি সত্যবতী-অরুণ ও চারণীদের কণ্ঠে 'ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর' গানটি বসাইয়াছেন—ইহার করুণ সুর আকাশ-বাতাস উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। শেষ গানটি হতাশার মধ্যেও আশার বাণী শুনাইয়াছে। নাটকের ঘটনা সংঘাত এবং সংলাপকে পৃথিবীর মাটিতে রাখিয়া সংগীতগুলির সুর একেবারে আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। নাট্যকার পিছনে পড়িয়া রহিয়াছেন, কবি সর্বত্র একটা মায়াময় রেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতির অপরূপ সুষমা ধরা পড়িয়াছে কোন কোন সংগীতে। নাটকের মধ্যে কবি নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের মনোভাব নানা সংগীতে উৎসারিত করিয়াছেন।

নাটকের ভাষার দিকে লক্ষ্য করিলেও কবির জয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরণের নাটকের ভাষা যতটা তীক্ষ্ণ হওয়া প্রয়োজন তাহা হয় নাই, ইহাতে এক বিশেষ উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দসিংহ-সত্যবতী এবং কোন কোন স্থানে সগরসিংহের ভাষা ভাবের আবেগে কম্পিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার নাটকের গদ্যকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে নাটকের সংলাপ কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা হইতে চরিত্রের স্বরূপ ধরিবার উপায় নাই। নাট্যকারের প্রচেষ্টার উপর কবি আসিয়া তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

নাট্যকার নাটকের কাহিনীও স্বস্থভাবে সাজাইতে পারেন নাই, সেখানেও কবির বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। নাটকে একটি কেন্দ্রস্থ সংঘাত বজায় রাখিতে হয়, 'মেবার-পতন'-এ তাহা সম্ভব হয় নাই। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বিশ্ববোধ এবং মানবতার উদ্বোধনের আদর্শ তাঁহার নাটকের কাহিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই নাটকে নাট্যকার প্রাধান্য পাইলে মানসী

চরিত্রটি বাদ পড়িত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মেবার লইয়া যে দ্বন্দ্ব তাহাতে জাতীয়তার উদ্বোধন হওয়াই স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে তাহাকে ছাপাইয়া গিয়াছে বিশ্ববোধ। নাটকের সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাহার ফলে একরকম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রদর্শনই যদি কাম্য হয় তবে মোগল-উদয়পুরের সংঘর্ষের ভিত্তিতে তাহা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। নাট্যকার ভাব উদ্বোধনের সহজ পথ হিসাবে পরিচিত কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কবির হস্তক্ষেপের ফলে সেই ভাবই বিপর্যস্ত হইয়াছে। কাহিনী জাতীয়তার প্রেরণা দানের উপযোগী ছিল—দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ তাহা গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না। সেই জন্যই মানসী চরিত্রটি কল্পিত হইয়াছে এবং তাহাতেই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব কেন্দ্রস্থ হইবার সুযোগ পায় নাই।

মেবারের পতনে বিষাদময়তায় যদি নাটকটি সমাপ্ত হইত তাহা হইলেও 'মেবার-পতন'-এর নাট্যধর্ম কিছুটা রক্ষা পাইত। আশাবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাও পারিলেন না—মানবতার আদর্শের কথা শুনাইয়া দিলেন। ইহাতেও নাটকের ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই নাটকে নাট্যকার অপেক্ষা কবিই যে অধিক প্রাধান্য পাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

'মেবার-পতন' নাটকে হাস্যরস :

হাস্যরসের স্পর্শ না থাকিলে কোন নাটকই জমজমাট হয় না। একটানা গম্ভীর সুর কখনই আড়াই তিন ঘণ্টা দর্শকদের মন আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং নাটকে হয় একটা রূপকথার মায়াজাল সৃষ্টি করিতে হয়, না হয় তো গম্ভীর সুরের সঙ্গে হাল্‌কা সুরের মিশ্রণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই নাটকেও নাট্যকার হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন।

'মেবার-পতন' নাটকের হাস্যরসকে কিছুতেই উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস বলা চলে না। যে হাস্যরস অজ্ঞতা, মূর্খতা, বৃথা দম্ভ হইতে সৃষ্ট হয় অথবা যাহা কেবল ভাষার উপর নির্ভরশীল তাহা হাস্যরস মহলে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে না। হেদায়েৎ, সগর, রাণী এবং জনসাধারণই এই নাটকে হাস্যরসের হাল্‌কা সুর সৃষ্টি করিয়াছে। হেদায়েতের বৃথা দম্ভ, হেদায়েৎ-হুসেনের কথা, আবদুল্লা-হেদায়েৎ-হুসেনের সংলাপ যথেষ্ট হাসির খোরাক দিয়াছে। সেনাপতি হেদায়েতের নির্বুদ্ধিতা এবং কৌশলে সেই সংবাদ পরিবেশন করিয়া নাট্যকার হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন—মানসীকে লইয়া হেদায়েতের রসিকতার চেষ্টা

তাহাকেই ব্যঙ্গের পাত্র করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও কোথাও হাস্যরস পরিবেশন করিতে গিয়া নাট্যকার যথাযোগ্যতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিতে পারে নাই কেন জাহাঙ্গীরের এই কথার উত্তরে হেদায়েৎ বলিয়াছিল, "জাঁহাপনা, আমার বরাবরই সেই ইচ্ছা ছিল। তবে আমার গৃহিণী স্ত্রী সে বিষয়ে আপত্তি কর্‌লেন।" সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার ভাগীনেয়র পক্ষে এই কথা বলা কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের বিপদের মধ্যে হেদায়েৎ-হুসেনের যে সংলাপ নাট্যকার দিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে অবাস্তব। যুদ্ধের পূর্বে যেরূপ কথাবার্তা সম্ভব যুদ্ধ চলাকালীন তাহা কখনই সম্ভব নহে। মেবারের বীর্যের পাশে মোগল সেনাপতি হেদায়েৎ একান্তই তুচ্ছ হইয়া অধিকতর উপহাসের পাত্র হওয়ায় হাসির উপাদান যোগাইয়াছে। নাট্যকার 'উইটি' ভাষা প্রয়োগ করিয়াও কোথাও কোথাও হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন দেখা যায়, "বড় বড় হাতী গেলেন তলিয়ে! এখন "মশায়" কি করেন দেখা যাক্।"

সগরসিংহের অজ্ঞতা-ভীরুতা এবং দম্ভ কম হাস্যরস সৃষ্টি করে নাই—সুতরাং ইহাও উচ্চতর হাস্যরস কিছুতেই নয়। "মহর্ষি বাল্মীকিটা কে? তুলসীদাসের ছেলে না?" এই অজ্ঞতা অথবা "আমার যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তেই জীবনটা কেটে গেল" এই দম্ভ হাস্যরসের উপাদান হইয়াছে। প্রতাপ অপেক্ষা তিনি বুদ্ধিমান এই কথার তুচ্ছতার মধ্যেও হাস্যরসের খোরাক আছে। রানা করিয়া দেওয়াতে তাঁহার বৃথা বিরক্তিও হাস্যরস সৃষ্টির কারণ হইয়াছে—অক্ষমের বিরক্তির মধ্যে একটু করুণ স্পর্শ থাকিলেও হাসি পায়। সেই কারণে এই স্থানে একটু উচ্চতর হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিরক্তি পরাধীনতার জ্বালা ব্যঞ্জিত করিয়াছে—নিছক অজ্ঞতা-মূর্খতা-দম্ভ অথবা ভাষার কৌশলের উপর ইহা নির্ভর করিয়া নাই।

রানা সম্বন্ধে রাণীর যে ভাব, যে ভাষণ তাহাও হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ কথার তাৎপর্য রাণী কিছুমাত্র বোঝেন না—ইহা অজ্ঞতা প্রসূত হাস্যরস। অনেক ক্ষেত্রেই নাট্যকারের প্রচেষ্টা নিতান্তই ছেলেমানুষীর পরিচয় দিয়াছে। যুদ্ধের বিপদের কথা রাণী শুনাইলেন কিন্তু রানার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন তাহা মনে হইল না। কন্যার বিবাহের জন্যই তাঁহার যত উৎকণ্ঠা, যুদ্ধ তাহার পরে হইলেই হইত: অর্থাৎ মানসীর বিবাহের পর রানা যুদ্ধে পর্যুদস্ত হইলে যেন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। এইরূপ ছেলেমানুষী

করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি 'নীলদর্পণ'-এর আদুরীর পক্ষে শোভা পায় মেবারের রাণীর পক্ষে এ আচরণ চরিত্রের যথাযথতা নষ্ট করে।

পল্লীবাসীদের সাহায্যেও নাট্যকার হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু তাহাও সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের ভীরুতা-দম্ভ-বৃথা তর্কের চেষ্টার উপর ভিত্তি করিয়া। সামান্য দুই একটি স্থান ব্যতীত এই নাটকের হাস্যরস যে স্থূল তাহাতে সন্দেহ নাই।

'মেবার-পতন' নাটকের মহানীতি :

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল 'মেবার-পতন'-এর ভূমিকায় বলিয়াছেন, "আমার অন্যান্য নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।...কিন্তু এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি।" সুতরাং নাটকে যে একটা উদ্দেশ্য আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সেই 'মহানীতি'র স্বরূপ সন্ধান প্রয়োজন এবং সেই নীতি নাট্যরস ক্ষুণ্ণ করিয়াছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখাও অসার্থক নহে।

সাহিত্যিকগণ জাতীয় জীবনকে পরিচালিত করেন, তাহা উদ্দেশ্য সাধনের ভিতর দিয়াও হইতে পারে আবার সৌন্দর্য চিত্রণের দ্বারাও হইতে পারে। এই কার্য সাধনে নাট্যকারগণের সুযোগ আরও অধিক—চক্ষুর সম্মুখে নাটকীয় ঘটনা প্রদর্শনের দ্বারা তাঁহারা দর্শক মনকে সহজেই আকর্ষণ করিতে পারেন : জাতীয় বীরের চরিত্রের স্বরূপ ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহারা দর্শক-চিত্ত উচ্চভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। আবার জাতীয় মনের দ্বারাও অনেক সময় সাহিত্যিকরা নিয়ন্ত্রিত হন না এমন নহে। যখন এইরূপ ঘটে তখন অনেক সময় নাট্যকাররা ঘটনা এবং চরিত্রের ঐক্য বজায় রাখিতে পারেন না, জাতীয় মনের দিকে চাহিয়া কখন কখন তাঁহাদের অবান্তর চরিত্রও সৃষ্টি করিতে হয়; এমন কি ইতিহাসকে বিকৃত করিতেও তাঁহারা বাধ্য হইয়া পড়েন। অনেক সময় নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়াও তাঁহারা এইরূপ অসাহিত্যিক কার্য করিয়া বসেন।

'মেবার-পতন' রচনার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই রাজশক্তি হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল এবং তাহাতে কিছুটা কৃতকার্যও হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিয়াছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ব্যতীত জাতীয় জীবনের প্রকৃত মঙ্গল নাই। তাই তাঁহার অনেক নাটকেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে

মিলন সাধনের উদ্দেশ্য বিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় জীবনকে পথ নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যেই মুসলমান ধর্মান্তরিত মহাবৎ খাঁর প্রতি হিন্দু-রাজপুত রমণী কল্যাণীর প্রেম এবং দুঃখবরণ, দেশ আক্রমণকারী ভ্রাতা মহাবৎ-এর সহিত স্বাধীনতা কামী ভগ্নী সত্যবতীর প্রীতিপূর্ণভাব, সাজাহানের ঔদার্য এবং সর্বোপরি মানসীর সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সাধনার চিত্র 'মেবার-পতন'-এ অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ইতিহাসের ঘটনা বিকৃত হইয়াছে। নাট্যকার নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইতিহাসকেও পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন।

ইংলণ্ডে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসারিত জীবনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ভারতের পুরাতন আদর্শ এবং ইউরোপের বর্তমানের কর্মচাঞ্চল্য তাঁহাকে জীবনের সত্য পরিচয় দিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে কর্মহীনতাই ক্লীবত্ব আনে আর সেই ক্লীবত্ব হইতেই আসে ক্ষুদ্রতা। পূর্ব হইতেই জাতীয় জীবনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাখী বন্ধনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলাল 'মেবার-পতন'-এ সেই রাখী বন্ধন দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্য গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যেও ইতিপূর্বে দয়াধর্ম; মানবধর্ম এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুর শোনা গিয়াছে —'মেবার-পতন'-এও সেই সুর ধ্বনিত হইল। জাতীয়তার উচ্ছ্বাস অথবা সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেম কখন মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতে পারে না, বিশ্বমানবের মিলনের ভিতর দিয়াই সুন্দরতর বিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। পরাধীন ভারতের পক্ষেও প্রতিটি ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হইবারও কোন কারণ নাই। পরস্পরের হস্ত প্রসারিত করিয়াই মানবতার মুক্তি সম্ভব। তাই জাতীয়তা অপেক্ষা মানবতা, দেশপ্রেম অপেক্ষা বিশ্ব-প্রেমই তাঁহার উপাস্য হইয়া উঠিয়াছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রীতিতে দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার দেশভক্তি খণ্ড ভূমিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই : স্বামীপ্রেম-দেশপ্রেমকে তিনি বিশ্বপ্রেমের সহিত সমন্বিত করিয়াছেন। নাট্যকার বিশ্ব-প্রেমের 'মহানীতি'তে উদ্বুদ্ধ হইয়াই 'মেবার-পতন' পরিকল্পনা করেন। এই নাটকের 'মানসী' চরিত্র সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সৃষ্ট ; সহৃদয় ন্যায়-পরায়ণ রানা অমরসিংহও সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ। 'মেবার-পতন' নাটকে যুদ্ধ ঘটনা, স্বাধীনতার প্রেরণা প্রভৃতি সব কিছুর উর্ধে মানসীর মহা-বাণী স্থান পাইয়াছে : মানসী কল্যাণীকে বলিয়াছে, "তোমার প্রেমকে

মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর"; সত্যবতীকে স্মরণ করাইয়াছে, "যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়।"

মানুষের প্রতি এক সীমাহীন বেদনা ও মমতায় দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় পূর্ণ ছিল—'মেবারপতন' নাটকে তাহার পরিচয় আছে। বিশ্বপ্রেমের 'মহানীতি'ই এই নাটক রচনার মূল প্রেরণা—মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই ইহার উদ্দেশ্য।

এই বিশ্বপ্রেমের মহানীতি নাটকে স্বচ্ছন্দে স্থান পায় নাই, স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। এই মহানীতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে 'মানসী' চরিত্র নাট্যকার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহিত ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই, বাস্তবেও এইরূপ চরিত্র সম্ভবপর কিনা সন্দেহ। নাটকের ঘটনার সহিত 'মানসী' চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িতও নহে। নাটকের শেষের দিকে অমর সিংহ এবং মহাবতের মাঝে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল, এই ঘটনাটুকু ব্যতীত মানসী সংক্রান্ত আর সমস্ত কাহিনী বাদ দিলেও নাটকের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না—এমন কি যুদ্ধোন্মুখ দুই বীরের মধ্যে কল্যাণী বা সত্যবতী আসিয়া দাঁড়াইলেও চলিত। সুতরাং 'মানসী' চরিত্র নাটকে অনিবার্য নয়—কেবল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইহা সৃষ্ট।

'মানসী'র মধ্যে নানা ভাবের সমাহার হইয়াছে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আর্ত সেবাপরায়ণা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এবং রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের মালিনী মানসীর মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মালিনীকে ব্যক্তি-গত প্রেমে সঞ্জীবিত করিয়া রক্তমাংসের মানুষ করিয়া লইয়া সার্থকরূপে দয়াধর্মে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সুযোগ পাইয়াও মানসীকে তাহা করিতে পারেন নাই। অজয়সিংহকে অবলম্বন করিয়া নাট্যকার সহজেই মানসীকে বাস্তব পৃথিবীর মানুষ করিয়া তুলিতে পারিতেন—কিন্তু আদর্শচ্যুতির ভয়ে অজয়সিংহের জীবিতকালে তিনি মানসীর প্রেম প্রকাশ করিতে পারেন নাই। নাইটিঙ্গেলের ন্যায় অবিবাহিতা থাকিলেই মানসীর পক্ষে আদর্শ রক্ষা সম্ভব হইবে এইরূপ ভ্রান্তধারণাই হয়তো নাট্যকারের হইয়াছিল। অথচ অজয়সিংহের মৃত্যুর পর একটি দৃশ্যে (৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) মানসীর যে রূপ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতিনাটকীয়, মানসীর চরিত্রের ধারাবাহিকতাও তাহাতে রক্ষিত হয় নাই। মহানীতি রক্ষা করিতে

গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল অবাস্তব এবং অপ্রয়োজনীয় চরিত্র সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। উদ্দেশ্য তাঁহাকে নাটকের ঔচিত্যবোধ রক্ষা করিতে দেয় নাই।

প্রচারধর্মিতা এই নাটকের শিল্প কর্ম একান্তরূপেই ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কেবল মানসী চরিত্রই অবাস্তব হইয়া উঠিয়া বিশ্বপ্রেমের আদর্শকে রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহাই নহে, নাটকটির মূল বক্তব্যের মধ্যেও একটি অসঙ্গতির সন্ধান পাওয়া যায়। 'মেবার-পতন'-এ যেমন একটি জাতীয় জীবনের পরাজয়ের বেদনার পরিচয় আছে সেইরূপ বিশ্বমৈত্রীর বাণীও মুখরিত হইয়াছে। মেবারের পতনে এবং ধ্বংসে মোগলের প্রতি ক্ষোভ সঞ্চার এবং সাজাহানের উদারতায় মুসলমানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি একই সঙ্গে এই নাটকের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। মহাবতের প্রতি একই সঙ্গে বিরূপতা এবং সহানুভূতির ভাব জাগে। অনেকগুলি দৃশ্যে রাজপুত-মোগলের সংঘর্ষের প্রস্তুতি ও যুদ্ধের কথাই বর্ণিত হইয়াছে; নিষ্ক্রিয় অমরসিংহকে গোবিন্দসিংহ-সত্যবতী প্রভৃতি যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—'মেবার পাহাড়' সঙ্গীতে উদ্দীপনার সঞ্চার করা হইয়াছে। আবার অন্যান্য দৃশ্যে মানসীর আদর্শবাদের পরিচয় পাওয়া যায়—সেই আদর্শবাদের নিকটে গোবিন্দসিংহ-সত্যবতী-'মেবার পাহাড়' সৃষ্ট জাতীয়তার উন্মাদনা তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। ইহার ফলে নাটকের মূল রসকেন্দ্রটি উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। 'মেবার-পতন'-এর মূল রস মেবারের পতনের বেদনায় না বিশ্বমৈত্রীর আদর্শের প্রবর্তনায় তাহা বুঝিয়া ওঠা দুরূহ হইয়া ওঠে। নাটকটি গতি চঞ্চল না হইলেও ইহার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়াছে মেবারের পতন কাহিনী। অজয়-সিংহ-সগরসিংহ-গোবিন্দসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে রাজপুত-মোগল সংগ্রামের কেবল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ আছে তাহাই নহে—প্রত্যেকটি মৃত্যু পাঠক-দর্শকের অন্তর দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করে: প্রতিটি মৃত্যু দেশপ্রেমের সঞ্জীবনী মন্ত্রস্বরূপ মনে হয়। অপরদিকে, মহাবৎ-সত্যবতীর মিলন, সাজাহানের উদারতা, মানসী-কল্যাণীর সংলাপ এবং সর্বশেষে যুদ্ধোন্মুখ অমরসিংহ-মহাবতের মধ্যে মানসীর আবির্ভাব এবং চারণীর সংগীত নাটকের উপরে যেন শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়াছে। ক্ষতাক্ত মেবারের বেদনা এবং বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ নাটকে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত হইতে পারে নাই: দেশপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের ধারা নাটকে সমান্তরালে প্রবাহিত হওয়ায় নাটকের রস কেন্দ্রগত হইয়া ওঠে নাই। আদর্শবাদের আতিশয্যেই নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

'মেবার-পতন'-এ কল্যাণী, সত্যবতী এবং মানসী তিনটি ভাবরূপ :

দ্বিজেন্দ্রলাল ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, "কল্যাণী সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্যপ্রেম, জাতীয়প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে।" একটু বিচার করিয়া দেখিলে নাট্যকারের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

এই সময়কার মার্জিত রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল—নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সতী-সাধ্বীর দেশে নারীর দুঃখভোগ, আত্মবিলোপ এবং নির্বিচার ভক্তির মহিমাই চিরকাল কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নারীকে অন্যরূপে দেখিয়াছেন। তিনি নারীর অপমান-লাঞ্ছনায় ব্যথিত হইয়াছিলেন। নারীর ব্যথা দীর্ণ অন্তরের মহিমা কীর্তনে ভারতীয় কাব্য মুখরিত হইলেও ভারতীয় দর্শনে নারীকেই শক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—অসুর দলন করিয়াছিলেন বিশ্বমাতা। নারীর সেই অসুর দলনী শক্তির, সেই মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় 'মেবার-পতন' নাটকে—দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকে নারীকে প্রধানতঃ তেজস্বিনী প্রেমময়ী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কল্যাণী-সত্যবতী-মানসী অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণী নয়—প্রকৃত রাজপুত রমণীর ন্যায়ই তাহারা ঘরে বাহিরে প্রেরণাদাত্রী। বহির্জগতের কর্মক্ষেত্র ইহাদের বরণীয়। রাজপুত জীবনাদর্শের সহিত আধুনিক জীবন-চেতনার মিলনে কল্যাণী-সত্যবতী-মানসী গঠিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকের মধ্য দিয়া এক মহানীতি প্রচার করিতে বসিয়াছিলেন—সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই এই নারী চরিত্র তিনটির পরিকল্পনা তিনি করিয়াছেন। এই নারীত্রয় তাঁহার অন্তরের বিশেষ ভাবের বাহন হইয়া উঠিয়াছে—তাহারা লেখকের বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতিরূপ মাত্র।

গোবিন্দসিংহের কন্যা কল্যাণীর স্বামীপ্রেমকে নাট্যকার উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। কল্যাণীর স্বামী সগরসিংহের পুত্র মহাবৎ খাঁ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া মোগলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রূপে পরিচিত হইয়াছেন। হিন্দু হইয়া মুসলমান স্বামীর সংসার করা যায় কিনা তাহা কল্যাণী বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা সত্ত্বেও স্বামীর প্রতি প্রেম তাহার হৃদয়ে সর্বদা উজ্জ্বল হইয়াই ছিল। স্বামীপ্রেম তাহাকে ধর্মের গোঁড়ামীর ঊর্ধ্বে লইয়া গিয়াছে—

মুসলমানের প্রতিও তাই তাহার অন্তরের বিদ্বেষ ছিল না। ভারতীয় আদর্শ বিশেষকে অবলম্বন করিয়া প্রেমকে নির্বিশেষের দিকে প্রসারিত করিতে বলিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালের সমাজের বিকৃত শাসন ভেদ সৃষ্টি করিয়া মানুষকে ধর্ম, জাতি প্রভৃতি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়াছে: নিজের অন্তরের প্রেমের আলোকে কল্যাণী সত্য চিনিয়া লইয়াছিল বলিয়া ভেদের গণ্ডী ছিন্ন করিতে সফল হইয়াছিল। পিতাকেও তাই সে প্রশ্ন করিয়াছে, "কেন মুসলমানের প্রতি তোমার এই আক্রোশ বাবা?" দাম্পত্য প্রেম, এমন কি কোন প্রেমই মানুষকে ক্ষুদ্র করে না। আঘাত পাইয়াও কল্যাণী স্বামীকে ভোলে নাই—"মহাবৎ খাঁ আমার স্বামী, পতি, দেবতা;—তা তিনি আমায় পায়ে রাখুন আর নাই রাখুন, সে আমার কাছে একই কথা।" স্বামীকে না পাইলেও স্বামীর প্রতি প্রেম তাহার জীবনে এতখানি সত্য হইয়া উঠিয়াছিল যে একান্ত প্রিয় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেও সে দ্বিধা করে নাই। কিন্তু কল্যাণীর এই প্রেম যে স্বামীর সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাম্পত্য-জীবন ভোগ করিবার ইচ্ছা মাত্র নয় তাহাও নাট্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন: মহাবৎকে পাইয়া তাহার রক্তপিপাসু জল্লাদ রূপকে ধিক্কার দিয়া কল্যাণী তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া গিয়াছিল। গর্বিত জল্লাদ মহাবৎ তাহার উপেক্ষার পাত্র হইলেও স্বামী মহাবৎ তাহার চিত্তে উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত ছিল। কল্যাণীর স্বামীপ্রেম রক্ত মাংসের মানুষকে ছাড়াইয়া এক আদর্শলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্ব অবস্থাতেই স্বামী স্ত্রীর উপাস্য, কল্যাণীর চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার সেই ভাবেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্বামীপ্রেমে সঞ্জীবিত ছিল বলিয়াই কল্যাণী সেই প্রেমকেই প্রসারিত করিয়া মানসীর কল্যাণ ব্রতের সাহায্যকারিণী হইতে পারিয়াছে।

সত্যবতী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নারী। স্বামী তাহার যুদ্ধে নিহত হইয়াছে—পিতা মোগল সম্রাটের পদলেহী; ভ্রাতা মাহাবৎ খাঁ মোগলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তথাপি সে পিতা-ভ্রাতা-পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া চারণী ব্রত লইয়া মেবারের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাজপুতদের মোগলের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত রাখাই তাহার জীবনের ব্রত, চারণদল লইয়া সে পাহাড়ে পাহাড়ে জাতীয় চেতনার উন্মাদনা সঞ্চার করিয়া বেড়ায়—

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর
বিরাট্ দৈন্য-দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।

রানা যখন সন্ধি করিতে উদ্যত তখন সত্যবতীই উৎসাহ দান করিয়া উদ্দীপিত সামন্ত বীরদের এবং উৎসাহহীন রানাকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। বার বার সে রানাকে যুদ্ধের প্রেরণা দিয়াছে, দৃঢ় কণ্ঠে শুনাইয়াছে, "বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে! দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে, দুঃখ সেই দেশের, যে দেশের বীর মরে না।" নিজের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা সে মোগলের পদলেহী ভ্রান্ত পিতাকে পর্যন্ত দেশ-গৌরব স্মরণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিতে প্রেরণা দিয়াছিল।

যেখানে উৎসাহের অভাব সেখানেই সত্যবতী। যুদ্ধে রানাকে প্রেরণা দিতে বার বার সে রাজসভায় আসিয়াছে—আবার, চারণদল লইয়া, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত পথশ্রম তুচ্ছ করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া গ্রামবাসীদের রানার সৈন্যদলে যোগদান করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। অত্যন্ত সক্রিয় এবং গতিশীল এই নারী। অজয়সিংহের মৃত্যুর পর সে গোবিন্দসিংহকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এই উৎসাহদান যে কেবল মুখের কথা মাত্র নহে, ইহা যে তাহার নাড়ীর সঙ্গে জড়িত তাহার প্রমাণও নাট্যকার দিয়াছেন: নিজ পুত্রের মৃত্যু বিপদে মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হইলেও সে অটল স্থির—"সগৌরবে তীব্র আনন্দে অরুণের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন।" যুদ্ধে রাজপুতের মৃত্যু তো গৌরবের। নাট্যকার সত্যবতীকে তীব্র দেশাত্মবোধের সজীব মূর্তি করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।

মানসী বিশ্বপ্রেমের ভাবরূপ। নাটকে প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে তাহাকে সর্বপ্রথম দেখা গিয়াছে, সেই সময়েই তাহার মুখে শোনা গেল, "মানুষ মাত্রকেই ভালবাসি।" সমস্ত মানুষের প্রতি এই উদার ভালবাসা প্রসারের ফলেই সে মহিয়সী হইয়া উঠিয়াছে। জাতি-ধর্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সে কখনও বাঁধা পড়ে নাই। দৈব প্রেরণায় তাহার অন্তর প্রথম হইতেই উদ্ভাসিত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা যখন রণহিংসায় উন্মত্ত তখন সে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেরই সেবায় নিযুক্ত—দেশ আক্রমণকারী মুসলমান সেনাপতিও তাহার সেবা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যেও সে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করে—দয়াধর্ম এবং সেবা-

ব্রতই তাহার জীবনের আদর্শ। মানুষকে সে খণ্ডিত করিয়া দেখে নাই, মানুষ হিসাবেই মর্যাদা দিয়াছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই বাণী তাহার জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে ; সে বলে, "প্রেমের রাজ্যে সুন্দর-কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই ; প্রেমের রাজ্য পার্থিব নয়।"

তাহার জীবনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেম জন্মে নাই তাহা নহে, কিন্তু বিশ্বপ্রেমের মহৎ প্রেরণা তাহাকে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ তুচ্ছ করিতে শিখাইয়াছে, তাই নিজের ব্যক্তিগত প্রেমকে সে গোপন করিয়াই রাখিয়াছিল। নাট্যকার মহৎ বিশ্বপ্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য মানসীর ব্যক্তিগত জীবনের আত্মোৎসর্গের মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন। সে মাতাকে জানাইয়াছে, "পরিণয়ের গণ্ডীর মধ্যে আমার জীবনকে আবদ্ধ করে রাখ্‌বো না। আমার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়", কল্যাণীকে বলিয়াছে, "তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর" এবং সত্যবতীকে স্মরণ করাইয়াছে, "যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড"। সর্বশেষে যুদ্ধরত পিতা এবং মহাবৎ খাঁকে নিজের কালিমা, দেশের কালিমা 'বিশ্বপ্রেমে ধৌত' করিতে অনুরোধ জানাইয়াছে. বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে সে মহৎ বাণী উচ্চারণ করিয়াছে—

কিসের শোক করিস ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'

ধর্ম যথা সেদিকে থাক, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক—আবার তোরা মানুষ হ'

মানুষ হইয়া উঠিলে সমস্ত দৈন্য দূর হইয়া যাইবে। মানসী সেই মনুষ্যত্বের পূজারী—ব্যক্তি এবং দেশের ঊর্ধ্বে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে বিশ্বপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে।

তিনটি নারী চরিত্রকে নাট্যকার তিনটি ভাবের বিগ্রহরূপেই যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাবাদর্শের রূপ গ্রহণ করায় চরিত্রগুলির মধ্যে পূর্ণতা লক্ষিত হয় নাই। বিশ্ববোধের কোন প্রত্যক্ষ আদর্শ না থাকায় মানসী চরিত্রই সর্বাপেক্ষা কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়।

'মেবার-পতন' এর সংগীতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ :

'মেবার-পতন' নাটকে সর্বসমেত এগারটি সংগীত আছে। সংগীতগুলি নাটকটির বক্তব্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। একটি গান রাজকবি কিশোরদাসের—রানার বন্দনা করিয়া রাজসভায় কিশোরদাস এই গানটি গাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার রানা মোগলদের পরাভূত করিয়াছেন, রাজপুতদের তাই অনেক আশা—কবির কণ্ঠে জাতির সেই আশাই ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু গান সমাপ্তির পর রানা বলিয়াছিলেন, 'কিশোরদাস' তোমার গানের শেষে আর এক চরণ যুড়ে দিও"—"সবই যাবে তব পাপে"। রানার মনের বিষণ্ণভাবের পরিচয় এই কথার মধ্যে পাওয়া যায়।

পরের গানটি নাট্যকার বসাইয়াছেন রাজপুত রমণীগণের কণ্ঠে—হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া আজ তাহারা নৃত্যগীতে বিলসিত। এই নৃত্যগীত, উৎসব রানার চিত্তে তত্ত্ব কথা জাগ্রত করিয়াছে—'সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা'। সংগীত দুইটি রানার চিত্ত উদ্বোধনে এবং প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

এই নাটকে পাশাপাশি সমান্তরালে প্রবাহিত দুইটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে নাট্যকার দেশপ্রেমে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন—অপরদিকে তাহারই পার্শ্বে বিশ্বপ্রেমের মহানীতির কথাও স্মরণ করাইয়াছেন। সত্যবতী ও মানসী দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ। সত্যবতী চারণদল লইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়—গ্রামবাসীদের যুদ্ধে উৎসাহিত করাকেই সে জীবনের ব্রত করিয়াছে। নাটকের প্রথমে আছে দেশপ্রেমের কথা তাই দেশপ্রেমের উদ্বোধনী সংগীত সেখানে গীত হইয়াছে; পূর্বতন গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া জাতির চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেল—

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর,
বিরাট দৈন্য-দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।

* * *

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে বিজয় সংগীত শোনা যায় চারণদের কণ্ঠে। এই সংগীতে আছে অমরসিংহ এবং রাজপুত বীরদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন।

যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে তাহাদের কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতে হইবে—জাতির প্রয়োজনে প্রাণ উৎসর্গ করিবার প্রেরণা যে তাহারাই দিয়া থাকে। সব মিলাইয়া সংগীতটি দেশরক্ষার উৎসাহবাণীতে প্রদীপ্ত। ইহার পর সত্যবতীর চারণদলের শেষ সংগীতে বিষাদময় সুর। মেবারের পতনের ব্যথায় সংগীতটিও দীর্ণ—

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার,
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর ?

তবু মনে আশা রহিয়া যায়—ভবিষ্যতের রাজপুত যেন এ গৌরব গাথা শুনিয়া উৎসাহ লাভ করে—

গেছে যদি সব সুখ কলরব, অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্,
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে শূন্যে মেবারে ধ্বনিয়া যাক্।

'মেবার-পতন'-এর জাতীয়তা উদ্দীপক ভাবধারার সহিত সংগতি রাখিয়া এই গানগুলি রচিত হইয়াছে : রাণা এবং রাজপুত জাতির মনোভাবই এই গানগুলিতে প্রকাশিত।

অবশিষ্ট সংগীতগুলি মানসীর কণ্ঠে শ্রুত হইয়াছে—শেষটি অবশ্য মানসীর দ্বারা শিক্ষা-প্রাপ্ত চারণীদলের কণ্ঠে নাট্যকার বসাইয়াছেন, মানসী তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল এইমাত্র। এইগুলির মধ্যে দুইটি সংগীত মানসীর ব্যক্তিজীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত। যে কথা মুখে বলা হয় নাই, সেকথা সংগীতের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বপ্রেমে উৎসারিত মানসীর মহীয়সী জীবনেও যে একটা ব্যক্তি জাগিয়া আছে তাহা কথায় বলা যায় না—অন্তরের গোপনে যে ব্যক্তিটি জাগিয়াছিল তাহার পরিচয় যেন কতকটা আপন অজ্ঞাত-সারেই সংগীতের ভিতর দিয়া সে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। একটি সংগীতে নাট্যকার স্পষ্টরূপেই মানসীর অন্তর উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন—'কত ভালবাসি তায়—বলা হোলো না'। অন্য সংগীতগুলির মধ্য দিয়া মানসী বিশ্বপ্রেমের অমৃতবাণী শুনাইয়াছে। কোথাও তাহার প্রেম প্রবাহিত করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, কোথাও প্রেমের মহান ভাবে সে বিভোর—'প্রেমে নর আপন হারায়, প্রেমে পর আপন হয়'।

শেষ সংগীতটি কেবল নাটকের উপসংহারই নয়, জীবনের উপসংহারের আদর্শস্বরূপ—'বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান'। বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইবার মহাবাণী ইহা। নাটকের উদ্বোধন হইয়াছিল

দেশপ্রেমের মহান বাণীর উদ্বোধনী সংগীত উচ্চারণ করিয়া, উপসংহার হইল মানবতার অমর বাণীর সুর বিস্তার করিয়া। জাতীয়তায় মানুষের উন্মেষ—মানবতায় তাহার সমাপ্তি। সংগীতের সাহায্যে নাট্যকার দুইটি ধারাকে সজ্জিত করিয়া মনুষ্যত্বের মহিমার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছেন।

'মেবার-পতন' বিষাদঘন হইলেও আশার বাণী শুনাইয়াছে :

'দীর্ঘ সপ্তশতাব্দীর' স্বাধীন গৌরবোজ্জ্বল জীবন যাপনের পর পরাধীনতার কালো মেঘ যখন মেবারের উপর নামিয়া আসিল তখনকার কাহিনী 'মেবার-পতন' নাটকের উপজীব্য হওয়ায় ইহা বিষাদঘন হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপ সিংহের সময় চারিদিকের বিপদের আবেষ্টনী সত্ত্বেও মেবারের বীরত্বের গৌরব আকবরেরও ঈর্ষার উদ্রেক করিয়াছিল—অমরসিংহের শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে সেই গৌরব রবি অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছিল। রণক্লান্ত জাতি সুদীর্ঘ বার বৎসর বিশ্রাম পাইয়া রণবিমুখ হইয়া উঠিতেছিল—সমগ্র জাতি আরামপ্রিয় হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। প্রতাপসিংহের পুত্র হইয়াও যুদ্ধের কোন উদ্যোগ না করিয়া অমরসিংহ পরাধীনতার শৃঙ্খল বরণ করিয়া লইবেন স্থির করিলেন। রানার চিত্তের বিষাদ নাটকের মধ্যে জড়িত হইয়া গিয়া ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের কথাই স্মরণ করাইয়াছে। প্রথম যুদ্ধ জয় করিয়াও কিশোরদাসকে রানা যখন বলেন, "কিশোরদাস! তোমার গানের শেষে আর এক চরণ যুড়ে দিও"—"সবই যাবে তব পাপে", তখন রানার মনের বিষণ্ণতার ছায়া সমস্ত নাটকখানিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। রানা জয়ের মধ্যেও আশাহীন, যেন নিয়তির লিখন তিনি দেখিয়া লইয়া তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য শান্ত চরণে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

চারিদিকের আশাহীনতার অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় গোবিন্দসিংহ-সত্যবতীর উদ্দীপনা সঞ্চার পাঠক-দর্শক চিত্তে অতীত গৌরব-কথা মুহূর্তের জন্য আনিয়া দিয়াছে; অজয়সিংহের আত্মত্যাগ, অরুণ-সিংহের যুদ্ধোদ্যম মেবারের বীরদের শেষ আভাসটুকু রাখিয়া গিয়াছে। বিদ্যুতের দীপ্তি যেমন মুহূর্তের জন্য চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া অন্ধকার গাঢ়তর করিয়া তোলে, এই বীরদের দ্বারা উদ্দীপ্ত অতীত বীরত্বের স্মৃতিও সেইরূপ বর্তমানের অবসাদ এবং গৌরবহীনতার কথা অধিকতর বিষাদময় রূপে স্মরণ করাইয়া দেয়। নাট্যকারও পরাধীন ভারতের বেদনার কালো তুলিকা

দিয়া মেবারের বেদনা চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া তাহা এত বিষাদঘন হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দসিংহের কণ্ঠে নাট্যকার যেকথা দিয়াছেন তাহাতে মানব চিত্তের হাহাকার-ধ্বনিই শোনা যায়, "সব গিয়েছে। আর কি আছে জয়সিংহ? এখন আছে সেই মহিমার শেষরশ্মি। এখন দেখছি একটা ম্রিয়মাণ গৌরব মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ নেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।"

সত্যবতীর দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করা, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া দেশগৌরব স্মরণ করাইয়া গ্রামবাসীদের উদ্দীপ্ত করা কোন কাজেই লাগিল না—মহাবৎ-এর কামানের গোলা মুহূর্তে সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলিল। বার বার যুদ্ধ জয় করিয়াও শেষ রক্ষা করা গেল না। গোবিন্দসিংহের উদ্দীপনা আতসবাজির ন্যায় আকাশে কিছুটা আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া ভস্মে পরিণত হইল। অমরসিংহ প্রাণ দিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় রণক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও শেষ অপমান বরণ করিবার জন্য জীবিতই রহিয়া গেলেন। যে সত্যবতী গ্রামবাসীদের স্মরণ করাইয়া দিতেছিল—"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়— যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর", সেই সত্যবতীকেই বিষাদ খিন্ন মনে স্মরণ করিতে হইল—"ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।" এই নাটকের সর্বাপেক্ষা সচল এবং সজীব চরিত্র এই নারীর— বিষাদের ছায়া তাহাকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অজয়সিংহের মৃত্যু মানসীর হৃদয়ে কঠিন আঘাত করিয়াছিল। মানসীর বিহ্বলতা যদি স্থায়ী হইত তবে যে 'মেবার-পতন' ট্র্যাজিডি হইয়া উঠিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অমরসিংহ এবং মহাবৎ খাঁর যুদ্ধ তাহা হইলে বন্ধ হইত না, একজনের মৃত্যুতে তাহার পরিণতি ঘটিত এবং সেই যুদ্ধে অমরসিংহ জয় লাভ করিলেও মোগলের হাতে রক্ষা পাইতেন না। পূর্ণ ট্রাজেডিতে নাটকের উপসংহার হইত। কিন্তু নাট্যকার এক মহৎ ভাবে নাটকটিকে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি যে মহানীতি লইয়া নাটকটি রচনা করিতে বসিয়াছিলেন তাহারই স্পর্শলাভ করিয়া নাটকটি বিষাদের মধ্যেও আশার বাণী উচ্চারণ করিয়াছে।

নাট্যকার দেশপ্রেম অথবা স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষাও মহত্তর আদর্শ প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন—তাই মেবারের পতনের কথা বলিয়া স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেই তিনি এই নাটকের ফলশ্রুতি করেন

নাই। বিশ্বপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ মানসীর বিহ্বলতা তাই ক্ষণস্থায়ী করিয়া তিনি তাহারই সাহায্যে বিষাদের মধ্যেও আশার বাণী শুনাইয়াছেন। অমরসিংহ-মহাবতের উদ্যত তরবারির মধ্যে আসিয়া সে দুঃখজনক পরিণতি ঘটিতে দেয় নাই। মহান সেবাব্রতে সে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছে—তাহার নিকট জাতিভেদ তুচ্ছ, মানুষ হিসাবেই মানুষের মর্যাদা। কল্যাণীর দুঃখময় জীবনকে সে সেবার কাজে নিযুক্ত করিয়া সার্থক হইয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছে ; সত্যবতীকেও ব্যর্থ হইয়া যাইতে দেয় নাই, বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মহত্তর জীবনের সন্ধান দিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মধ্যে দাঁড়াইয়া সে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া মানবতার জয় ঘোষণা করিয়াছে। যাহারা বিজিত ও বিজেতা রূপে চিরকাল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকিত তাহাদের মনে কোমলতা আনিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। তাহারই চারণদলের সম্মুখে বিস্মিত অমরসিংহ ও মহাবৎ খাঁ পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়াছেন। মানসীকে অবলম্বন করিয়া নাট্যকার বাঁচার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন—মৃত্যুপাণ্ডুর বিষাদময়তার মধ্যে আশার আলোক দেখা দিয়াছে। বিষাদাচ্ছন্ন রক্তসিক্ত ক্ষতাক্ত মেবারের উপর বিশ্বমৈত্রীর প্রলেপ লিপ্ত করিয়া তিনি মানবমনে আশার সঞ্চার করিলেন—মানুষ হইয়া উঠিলেই জগতের সকল প্রকার বেদনার অবসান হইবে। দেশ গিয়াছে দুঃখ নাই, মানুষ হইয়া উঠিলেই সকল চাওয়া এবং পাওয়া সার্থক হইয়া উঠিবে। যুদ্ধ জয়ের মধ্যে গৌরব নাই, একমাত্র প্রেমই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে—

ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশময় বর্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান ;

এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তোলার আকাঙ্ক্ষাই এই নাটকের ফলশ্রুতি। নাটকটির ট্র্যাজেডি হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা মানসী রোধ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশ্বমৈত্রীর মহামন্ত্র নাটকটির বিষাদময়তাকে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার মন্ত্রে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে।

'মেবার-পতন' ট্র্যাজেডি কি না :

একটি ত্রুটিকে কেন্দ্র করিয়াই কাব্যে ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়। নাটকের নায়ক অমরসিংহের জীবনের ত্রুটি ছিল তাঁহার বিলাসিতার প্রতি আকর্ষণ এবং

বিষাদাচ্ছন্নভাব। কিন্তু মেবারের পতনের তাহাই কারণ নহে। বিরাট সাম্রাজ্যের শক্তির সহিত মেবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে নাই—ইহা মেবারের অদৃষ্ট। মেবার পতনের পর রানার উচ্চ শির নত হইয়া গেল। ইহাতে পাঠক-দর্শক চিত্ত বেদনার্ত হইয়া ওঠে। এমনি করিয়াই অদৃষ্ট মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করিয়া দেয়। নিজের অন্তরে দুর্বলতা থাকিলে দুঃখ আরও ঘনীভূত হইয়া ওঠে। সুতরাং মেবার এবং অমরসিংহকে কেন্দ্র করিয়া ট্র্যাজেডি সার্থকরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মহাবৎ খাঁ জন্মভূমি মেবার আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। কল্যাণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি অনুতপ্ত, তাহাকে তিনি ফিরিয়া পাইতে চাহেন। তাহারই কথা স্মরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি মেবার আক্রমণ করিলেন। এই মেবার আক্রমণে যে বীভৎসতা তিনি সৃষ্টি করিলেন তাহাই তাঁহার জীবনে ট্র্যাজেডির কারণ হইয়া উঠিল। যে কল্যাণী তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিত সেই কল্যাণীই তাহাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান লক্ষ্য করিল। মহাবৎকে কেন্দ্র করিয়াও সার্থক ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হইতে পারিত।

সত্যবতী-কল্যাণীর বেদনাবোধ, মেবারের বিষাদাচ্ছন্ন আকাশ ট্র্যাজেডিকে যথেষ্ট ঘনীভূত করিয়া তুলিবার সুযোগ ঘটাইয়াছিল। কিন্তু নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল অন্যপ্রকার : তিনি ট্র্যাজেডির বিষাদময়তা সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। আশাবাদী মন লইয়া তিনি জাতিকে আশার বাণী শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ হিন্দু-মুসলমানের মিলন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়াছিল। এই লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্যই তাঁহার মেবার পতন নাটক রচনা। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তিনি মানসী চরিত্রটি কল্পনা করিয়াছিলেন। তাই নাটকের স্বাভাবিক বেদনাদীর্ণ পরিণতি না ঘটাইয়া তিনি তাহাকে আরও কিছুদূর টানিয়া লইয়া গেলেন। মানসীর 'আবার তোরা মানুষহ' সংগীতের সাহায্যে নাট্যকার অমরসিংহ-মহাবৎ খাঁর মিলন ঘটাইলেন। সত্যবতী-কল্যাণীও মানসীর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। সত্যবতীর দুঃখের সংগীতের সমমর্মী হইয়াছেন স্বয়ং সাহজাদা। হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের চেষ্টাতেই হইয়াছে নাটকের সমাপ্তি। সুতরাং নাটকটি বিষাদময় হইলেও নাট্যকার আশার বাণী শুনাইয়া বিষাদের কালো মেঘ বিদীর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাই নাটকটি ট্র্যাজেডি হইয়া উঠিতে পারে নাই।